কর্ম্মফল

ও

জন্মান্তর-রহস্য

শ্রীআশুতোষ দেব, এম. এ. প্রণীত।

কলিকাতা,

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক,

২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন, থিওজফিকাল পাবলিসিং সোসাইটী

হইতে প্রকাশিত।

১৩১২।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা।

১৯ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, 'বিশ্ব-ভাণ্ডার' প্রেসে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ম

দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম-পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ্. আর্. এস্. এল্.

ব্যারিষ্টার-এট্-ল,

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

পিতঃ!

আজ দশবৎসর যাবৎ আপনার পদতলে উপবিষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম ও দর্শনের যে সকল গভীর উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আপনার স্নেহের প্রতিদান করিতে এ হতভাগ্য নিতান্ত অক্ষম! অদ্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর পাইয়া, আপনার পবিত্র নামের সহিত এই পুস্তক জড়িত করিয়া ধন্য হইলাম এবং যথোচিত ভক্তি-সহকারে ইহা আপনার শ্রীচরণকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি।

পুষ্পদোলপূর্ণিমা,
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল।

শ্রীচরণাবনত
শ্রীআশুতোষ দেব।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে 'সাহিত্য-সংহিতা', 'নব্যভারত', 'পন্থা', প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাহিত্য-সভার' এবং 'বঙ্গীয় থিয়োজফিকাল্ সোসাইটীর' অধিবেশন সমূহেও এই পুস্তকের কতক কতক অংশ পঠিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটী সভার সভ্যগণের উৎসাহে এবং বন্ধুবর্গের অনুরোধে পূর্ব্ব প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মের দুইটী মূল তত্ত্ব। বুদ্ধদেবের 'ধর্ম্মচক্র'ও কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এ সম্বন্ধে নীরব! বৌদ্ধেরা বলেন যে কেবল সুকর্ম্মের দ্বারা কুকর্ম্মের ফল ক্ষয় হইয়া থাকে, সুতরাং পুনর্জ্জন্মের এবং তজ্জনিত দুঃখের 'নির্ব্বাণ' হয়। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে কর্ম্মফলনিবন্ধন জন্মান্তর ও দুঃখলাভ ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক মানব জাতির এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যক্তি কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন জীবনসমস্যার মীমাংসা করিবার অন্য উপায় নাই।

বিষয় দুইটী জটিল; সেইজন্য বিভিন্ন ভিত্তি হইতে আমি ইহাদের আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষের সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

এই পুস্তকের প্রণয়ণসম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদের নিকট বিশেষ রূপে ঋণী। প্রাচ্য দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে এবং Madame Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, Sinnett প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের পুস্তকাদি হইতে এবং Theosophical Review, Light, Theosophist, Vahan, Prasnottar প্রভৃতি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। যে সকল গ্রন্থকার এবং প্রবন্ধকারদের নিকট আমি ঋণী, তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

১৮ নং, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা.

শ্রীআশুতোষ দেব।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল।

সূচীপত্র।

কর্ম্মফল।

জন্মান্তর-রহস্য।

কর্ম্মফল।

(THE LAW OF KARMA.)

প্রথম প্রস্তাব।

কর্ম্মের সাধারণ অর্থ হইতেছে কার্য্য বা ক্রিয়া; কিন্তু কার্য্যের কতকটা অতীতে বর্ত্তমান থাকে, কতকটা অধুনা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কতকটা ভবিষ্যতে বর্ত্তমান থাকিবে, এই জন্য কর্ম্মফলঅর্থে কার্য্যকারণের শৃঙ্খলরূপ নিয়মকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং, আমরা যাহাকে কর্ম্মের ফল বলিয়া থাকি, তাহা কর্ম্ম হইতে পৃথক্ নহে, কর্ম্মেরই একটী অংশমাত্র। যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় কোন সৈনিক পুরুষ, শরীরে আঘাত পাইলে যেমন যুদ্ধ-সময়ে কোন বিশেষ বেদনা অনুভব করে না, কিন্তু যখন নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করে, তখন সে শরীরের আঘাত জন্য কষ্ট অনুভব করিতে থাকে, সেই রূপ কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া সদ্যঃ কষ্ট না পাইলেও, পরে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। অগ্নি হইতে উত্তাপ যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ আঘাত হইতে ব্যথা পৃথক্ নহে, উত্তাপ বা আঘাত ফলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। সেই জন্য বলা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক বিষয় অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক কর্ম্ম কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে,—এই সামান্য তথ্যের উপর কর্ম্মবাদের ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে,—কতকগুলি সহকারিশক্তির সমবায়কে (resultant) কারণ (cause) বলে এবং কতকগুলি কর্ম্মের (activities) সমষ্টিকে ফল (effect) বলে। এই সকল কার্য্য ও কারণ একই প্রকারের এবং যে নিয়মের

দ্বারা এই সকল কার্য্য ও কারণ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আমরা যত দূর অবগত আছি, সেই নিয়ম নিত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশূন্য। পার্থিব জগতে আমরা যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলি, সেই বিজ্ঞানও পূর্ব্বোক্ত ভিত্তির উপর অবস্থিত। কারণ, নিয়মসকল অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসকল একই সত্যকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। নিয়মসকল অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াতে কোন্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কিরূপ ফল হইবে, তাহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানও কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অন্তর্গত। যখন আমরা এই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলটিকে অনুসরণ করিয়া, অপার্থিব সূক্ষ্ম জগতে উপস্থিত হই, তখন কর্ম্মবাদ বা কর্ম্মের নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাই এবং তখন বুঝিতে পারি যে, কার্য্যকারণের একই নিয়ম পার্থিব ও অপার্থিব রাজত্বকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তখন নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানের রাজত্ব সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে।

যখন আমরা কোন একটী সামান্য ঘটনার কারণ (cause) অনুসন্ধান করিতে যাই, তখন একটী সামান্য কারণের পরিবর্ত্তে আমরা কতকগুলি জটিল কারণ দেখিতে পাই; ইহারা সকলে মিলিত হইয়া একটী ফল (effect) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটিকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। কর্ম্মের এই সকল বিভিন্ন উপাদানকে দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, নিমিত্ত, নিয়ামক, প্রভৃতি কারণ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন একটী কর্ম্মকে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার উপাদানে বা কারণে বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন উপাদানকে বা কারণকে স (Synthesise) করিয়া পুনর্গঠিত কর্ম্মে পরিণত করিয়া হৃদয়ঙ্গম আমাদের পক্ষে অসাধ্য। আমরা একটি কর্ম্মকে নানা প্র কারণে বিশ্লিষ্ট করিতে পারি, কিন্তু নানা প্রকার কারণকে সং করিলে কিরূপ কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। কার্য্যটি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, আমরা সেই কার্য্যটির কেবল একটি উপাদান গ্রহণ করি এবং অপরগুলি ত্যাগ করিয়া থাকি এবং ঐ উপাদান পূর্ব্বোক্ত কার্য্যটির যেন একটিমাত্র পূর্ণ কারণ,—এইরূপ ভাবিয়া থা বিভিন্ন উপাদানসমূহকে সকলে গ্রহণ করে না বলিয়া, আমরা আম

চতুর্দ্দিকে বিবাদ, বিসংবাদ এবং বিপরীত মত সকল দেখিতে পাই। এক্ষণে আমরা যদি কর্ম্মবাদ বুঝিতে যাই, তাহা হইলে কর্ম্মসমূহের বিভিন্ন উপাদান-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এই উপাদানসকল মোটামুটি হিসাবে তিনটি,—ইহারা বিশ্বের তিনটি নৈসর্গিক প্রভাব (influence) মাত্র, প্রত্যেকে স্ব স্ব নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। ইহারা একত্র হইয়া যদিও সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত, ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

এই তিনটি প্রভাবের প্রথমটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির 'অন্ধ' শক্তিসমূহ (blind forces) হইতে আসিয়া থাকে। এই শক্তির প্রভাব না মানিয়া চলিলে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রভাবটি স্বতঃক্রিয়মাণাশক্তি (Spontaneous activity); ইহা অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্রসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিশ্বের চতুর্দ্দিকে কার্য্য করিতেছে; এই প্রভাবই প্রত্যেক পরমাণুকে এক একটি জীবনে (Unit of Life) পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং প্রত্যেককে বিশিষ্ট প্রকারের বৃত্তি ও বিশিষ্ট প্রকারের মূর্ত্তিমান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন্ত বস্তুর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যকে তৃতীয় প্রভাব বলে,—প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপকার বা সুখের জন্য কার্য্য করিতেছে। যখন আমরা ভাবিয়া থাকি যে, আমরা কোন নিগূঢ় ক্ষমতার দ্বারা চালিত হইতেছি, তখন প্রথম প্রভাবকে আমরা ভাগ্য (destiny) বা অদৃষ্ট (fate) বলিয়া থাকি। দ্বিতীয় প্রভাবের উপর সৃষ্টির আধুনিক ব্যাখ্যা, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের (evolution) ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। আদর্শরূপে এবং বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিলে তৃতীয় প্রভাবকে পাশ্চাত্য ধর্ম্মসকলের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। প্রথম প্রভাবের জন্য আমরা আমাদের জীবনের অসংস্কৃত (Raw) উপাদানসকল পাইয়াছি। এই সকল অসংস্কৃত উপাদান আমাদের ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া, দ্বিতীয় প্রভাব আমাদিগকে কার্য্য করিবার যন্ত্রাদি এবং সুবিধা প্রদান করিয়াছে, এবং যাহাতে আমরা উহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারি, সেই জন্য তৃতীয় প্রভাব আমাদিগকে বাসনা এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছে।

(৫ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পরমপুরুষের তিন প্রকার বিভাবের (Aspects)

কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিন বিভাব অনুসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অশরীরী প্রথম পুরুষ তত্ত্বসমূহের আত্মা; সৃষ্টি-রচনা হইবে না বলিয়া ঈশ্বরের এই উপাধিগ্রহণ। এই সকল তত্ত্ব আমাদের জীবনের অসংস্কৃত (raw) উপাদানমাত্র। আমরা যাহাকে প্রথম প্রভাব বলিয়াছি, তাহা এই প্রথম পুরুষেরই প্রভাব (influence)। তত্ত্বসকল উদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে জীবসংস্থান হইবে না বলিয়া, পুরুষ অন্য বিভাব ধারণ করিয়া দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি তখন বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন লোক রচনা করিতে সমর্থ হন। এই দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আমরা দ্বিতীয় প্রভাব (influence) পাইয়া থাকি। ইহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অসংস্কৃত উপাদান সকলকে ব্যবহারে আনিবার জন্য, আমরা কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয়াদিরূপ সম্বাদ এবং সুবিধা পাইয়াছি। তৃতীয় বিভাব অনুসারে পুরুষ, প্রতি জীবের আত্মা ও ঈশ্বর। তিনি সকল ভূতের অন্তঃস্থ হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন। আমরা এই তৃতীয় পুরুষ হইতে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় প্রভাব পাইয়াছি। ইহার ফলে আমরা বাসনা ও বুদ্ধি পাইয়াছি।

আমরা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই তিনটি প্রভাব যথোপযুক্ত আলোচিত না হইলে, কর্ম্মবাদ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না, সুতরাং কর্ম্ম-ফলসম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ হইবে। আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, ইহারা প্রত্যেকে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রভাবের একটিমাত্র প্রভাবকে নির্দ্দেশক চিহ্ন (distinguishing mark) বলিয়া গ্রহণ করে এবং কেবল মাত্র এক প্রকার প্রভাবকে জীবনব্যাপারের ভিত্তি বলিয়া অবগত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাক্ষ্য দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সামান্য হইতে বিশেষ অনুমাণ প্রণালী অনুসারে (deductively) তর্ক করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রথমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। ইহারা মনুষ্যের শক্তি অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর একটি শক্তিকে অনুভব করিয়া থাকে এবং এই বিশ্বে যে একটি অভিপ্রায় বা সংকল্প (purpose) বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই সংকল্পের বিরুদ্ধে মনুষ্য যে কিছুই করিতে পারে না, এইরূপ অনুভব করিয়া তাহারা 'অদৃষ্টবাদী' (fatalist) হইয়া পড়ে। তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে যে, সমুদয় বিষয়

কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে এবং ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তিনি অসীমক্ষমতাময়, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাঁহাকে কেবল ভয় ও সম্মান করিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে ক্রমবিকাশবাদী বলা যাইতে পারে, তাহারা জীবন্ত বস্তুর স্বতঃ-ক্রিয়মাণ শক্তির (spontaneous activity) উপর তাহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকে; তাহারা বলে যে, এই সকল জীবন্ত বস্তু আক্রমণ ও সংঘর্ষণের ফলে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশবাদীদের মতে ঈশ্বরের কোন সংকল্প বা পরিণামদৃষ্টির (prevision) প্রয়োজন নাই; তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে বটে, কিন্তু এই প্রকার বলিয়া থাকে যে, ঈশ্বর হস্তের নিকট যে সকল উপকরণ পাইয়া থাকেন, সেই সকল উপকরণকে কি প্রকারে বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যবহার করিবেন, কেবল মাত্র সেই জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে 'ধর্ম্মপ্রাণ' (religionists) বলা হইয়া থাকে। অদৃষ্টবাদীদের ন্যায় তাহারাও এই পৃথিবীতে যে কোন আকস্মিক দৈব-সংঘটন (accident) আছে, এইরূপ মানে না; কিন্তু অদৃষ্টবাদীদের মত ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহারা বিশেষ হইতে সামান্যানুমান অনুসারে (inductively) বিচার করে না; তাহারা সামান্য হইতে বিশেষ-অনুমান প্রণালী অবলম্বন করিয়া (deductively) থাকে এবং বলে যে, ভগবান্ দয়াময়, সুতরাং আমরা এই পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ, কষ্ট, অন্যায় আচরণ ও নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাইতেছি, তাহা ভগবানের দয়াপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং উহারা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ দুঃখাচ্ছাদিত সুখমাত্র। কর্ম্মবাদ পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার মহান্ প্রভাবসকলকে সমন্বয় করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরা অসম্পূর্ণভাবে মীমাংসা করিতে যাইয়া যে ভ্রমে পতিত হয়, সেই ভ্রম হইতে কর্ম্মবাদের দ্বারা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

প্রথম প্রভাবটির নাম অদৃষ্ট অর্থাৎ ইহা প্রকৃতির অন্ধশক্তিসমূহের (blind forces of nature) সমষ্টিগত কার্য্যের কল্পিত কারণ। কোন প্রকাশমান বিষয় অবশ্যম্ভাবিতার (necessity) হস্ত হইতে মুক্ত নহে, এই স্বীকার্য্য বা অভ্যুপগমের (postulate) উপর উক্ত প্রভাব স্থাপিত। নির্জীব পদার্থ হউক, অথবা অসামক্ষমতাপন্ন সজীব পদার্থ হউক, সকলেরই কার্য্যের সীমা আছে।

সুতরাং প্রত্যেক সত্তার, এমন কি উচ্চতম দেবতারও সীমা আছে, এইজন্য প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট স্বভাব ও বৃত্তি-(function) যুক্ত হইয়াছেন। যাহার নিকট আলোক অথবা অন্ধকার, শুভ অথবা অশুভ, আকর্ষণ অথবা বিপ্রকর্ষণ, সংজ্ঞা অথবা অসংজ্ঞা, স্থিতি অথবা প্রলয়, একই প্রকার বোধ হয়, এমন সত্তা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ সত্তার আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। দুইটী বিষম গুণের অস্তিত্ব থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহারা একই সময় এবং একই স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে কোন বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন সত্তা (Conditioned Existence) হয়, সেই মুহূর্ত্তে উহা অবশ্যম্ভাবিতা (inevitableness) এবং ভবিতব্যতার (necessity) রাজত্বের অন্তর্গত হইয়া থাকে। দেশ কাল এবং কার্য্যকারণের শৃঙ্খলের বাহিরে অপরিচ্ছিন্ন সত্তার (unconditioned existence) কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু উহা অসম্ভব হইলেও, মনুষ্য উক্ত প্রকার অস্তিত্ব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে আমরা অপরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞেয়, সর্ব্বব্যাপী, অসীম ক্ষমতাবান্ প্রভৃতি বলিয়া থাকি,—ইহারা সকলেই ব্যতিরেকমুখী পরিচায়কমাত্র (negative names) ; এই সকল উপাধির অর্থ আর কিছুই নহে, ইহারা এমন এক মহতী সত্তাকে বুঝাইয়া থাকে, যাহার ক্ষমতা, জ্ঞান, কিংবা ব্যাপকত্বের সীমা, আমরা কোন প্রকারে স্বীকার বা অভ্যুপগম (postulate) করিতে চাহি না। আমরা এই সকল উপাধির বিশেষ কোন অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে পারি না; উহারা যে সকল ভাব (ideas) প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

প্রথম প্রভাবটী (influence) প্রাকৃতিক রাজত্বে কার্য্য করিতেছে। ইহা আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া, আমাদিগকে এরূপ সীমার ভিতর আবদ্ধ করিয়াছে যে, আমরা সেই সীমার বাহিরে যাইতে পারি না; সুতরাং এই সীমাকে আমরা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। অবশেষে আমরা আমাদের এই প্রকার সসীমত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং যাহাতে আমরা এই সসীমত্ব আশ্রয় করিয়া যথাযোগ্য কার্য্য করিতে পারি, তাহার ও চেষ্টা করি। সকল প্রকার বিজ্ঞানই (Science)

এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি যে, যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রভাবকে উত্তমরূপে চিনিয়া থাকে তো সে এই বিজ্ঞান (science)। অদৃষ্ট অথবা প্রকৃতির অন্ধশক্তি সমূহের সর্ব্বান্তঃকরণে পূজার নামই বিজ্ঞান। একটী সাধারণ উদাহরণ হইতে আমরা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব। যদি আমরা কতকগুলি নুড়ির দ্বারা একটা পাত্রের অৰ্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া পাত্রটিকে নাড়িতে থাকি, তাহা হইলে বড় নুড়িগুলি উপরে আসিবে এবং ছোট গুলি নীচে পড়িয়া যাইবে। কেন এই প্রকার হইয়া থাকে—তাহার কারণ বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছে; যখন কারণটি স্থিরীকৃত হয়, তখন আমরা বলি যে ইহা প্রকৃতির নিয়ম, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বড় নুড়িগুলি উপরে যায় এবং ছোট নুড়িগুলি নীচে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির নিয়মরূপ কারণটী নির্দ্ধারিত হইলে, আমরা আমাদের সমুদয় কার্য্যকে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। যখন আমরা দেখি যে, একজন ব্যক্তি এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতেছে, যাহাতে পাত্রটী নাড়িলে বড় নুড়িগুলি নীচের দিকে যাইবে এবং ছোট নুড়িগুলি উপরে আসিবে তখন আমরা তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া থাকি,—কারণ, আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, নুড়িগুলি নাড়িলে, তাহার ফল অপরিহার্য্য। সমস্ত নুড়িগুলি কি প্রকারে উপরে আসিতে পারে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্যত দেখিলে, আমরা তাহাকে অর্ব্বাচীন বলিব, কারণ সে ব্যক্তি তিন মানকে (Dimensions) দুই মানে পরিবর্ত্তিত করিতে চায়। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ তর্ক করে যে, ক্ষুদ্র নুড়িগুলি অপেক্ষা নৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত অথবা অন্য কোন প্রকারে যোগ্য বলিয়া, বড় নুড়িগুলি উর্দ্ধে চালিত হইতেছে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিব। কিংবা সে ব্যক্তি যদি এইরূপ সাব্যস্ত করে যে, তাহার নিজের কোন 'খেয়ালের' জন্য, সে যখন পাত্রটীকে নাড়িয়া ছিল, তখন জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, সে এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল যে, বৃহৎ নুড়িগুলি উপরে যাইবে এবং ক্ষুদ্র নুড়িগুলি নিম্নে আসিবে এবং ঐ নুড়িগুলি তাহার বশবর্ত্তী ইচ্ছা মানিয়া কার্য্য করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে মতিভ্রষ্ট বলিয়া স্থির করিব।

এই সামান্ত উদাহরণ হইতে আমরা এমন একটী মূল তত্ত্বে (principle) উপস্থিত হই, যাহা চতুর্দ্দিকে কার্য্য করিতেছে—এইরূপ দেখিতে পাই; এই উদাহরণটী ক্রমোচ্চপদবিধির (hierarchical arrangement) একটি স্থূল উপমা মাত্র। বৃহৎ ঘুড়িগুলি উপরে চালিত হয় কেন? উহারা নিজেরা কখন আপনাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিতে পারে না। উহারা একদিকে ক্ষুদ্র ঘুড়িসকলের দ্বারা উপরে চালিত হয় এবং অপরদিকে উহারা ক্ষুদ্র ঘুড়িসকলকে নিয়ে চালিত করিয়া থাকে। ইহাকে অপরিস্ফুট জীববিকাশ (rudimentary form of organisation) বলে। বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য-সমাজের ভিতর এই মূল তত্বটি কার্য্য করিতেছে।

মনুষ্যের ভাগ্যসম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতাবলম্বীরা যেরূপ কল্পনা করে, সেই সকল কল্পনা ত্যাগ করিলে পর আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে প্রথম প্রভাব কর্ম্মবাদকে নিয়মিত (affect) করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রধান 'মুস্কিল' এই যে, ভগবান্ কি প্রকারে বিশেষ বিশেষ বিষয় সংঘটিত হইতে অনুমতি দিয়া থাকেন,—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মবাদের ভিতর এই প্রকার 'মুস্কিল' আসে না; পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অপরিহার্য্য ফল বলিয়া অথবা ভবিতব্যতার অধীনে ঐ সকল ঘটনা আসে বলিয়া, উহাদিগকে ত্যাগ করা হয়। একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী জলে নিমজ্জিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ জলে ঝম্প প্রদান করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি সন্তরণ না জানাতে উভয়েই ডুবিয়া গেল। প্রাচ্যেরা এই ঘটনাটি কর্ম্মের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং ঐরূপ ব্যাখাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন; এ বিষয়ে ভগবানের যে কোন 'আশয়' বা অভিসন্ধি (purpose) আছে, তাহা তাঁহারা মনে স্থানও দেন না; কিন্তু পাশ্চাত্যেরা এ বিষয়ে ভগবান্‌কে না জড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কোন প্রকারে পরীক্ষা করিবার অথবা শিক্ষা কিংবা শাস্তি দিবার জন্য ভগবান্ ঐরূপ ঘটনার বিধান করিয়াছেন। কিন্তু বক্তব্য এই যে, পরীক্ষা করিবার, শিক্ষা অথবা শাস্তি দিবার কি ভয়ানক নিষ্ঠুর অথবা নির্ব্বোধ উপায়! কিংবা পাশ্চাত্যেরা হয়তো বলিবেন যে, এই ঘটনাটীতে

ভগবানের কোন অভিসন্ধি (purpose) সিদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু জিজ্ঞাস্য এ, সর্ব্বশক্তিমানের আবার প্রয়োজন?

পুনশ্চ, যখন আমরা পদবিক্ষেপ করি, তখন কত শত ক্ষুদ্র প্রাণীকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়া থাকি; এই প্রকার প্রাণিহত্যায় আমাদের কোনও উপকার হয় না। সেই জন্য জিজ্ঞাস্য যে, কোন কল্পিত ভগবান্ কি এই হত্যা নিবারণ করিতে পারেন? যত দিন দেশ, কাল এবং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের অস্তিত্ব থাকিবে, যত দিন মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে এবং জন্তু জন্তু থাকিবে, তত দিন এই হত্যা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। এতৎসম্বন্ধে আমরা যতদূর ধারণা করি না কেন, সেই ভগবানের রাজত্বের বাহিরে দৈব অথবা অবশ্যম্ভাবিতার রাজত্ব না মানিলে, মানসিক অপবিত্রতার জন্য, যাহাকে আমরা ঈশ্বরে নিষ্ঠাপ্রদর্শন বলিয়া থাকি, সেই নির্ব্বোধ মতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ভগবান্ ইচ্ছা করেন বলিয়া সকল বিষয় ঘটিয়া থাকে, এই স্বীকার্য্যের (postulate) উপর কর্ম্মবাদ নির্ভর করে না; কিন্তু সকল বস্তু তাহাদের প্রকৃতি-অনুযায়ী কার্য্য করে—এই স্বীকার্য্যের উপর কর্ম্মবাদ নির্ভর করিতেছে। আমরা যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, যাহাদিগকে আমরা নির্জীব (inanimate) পদার্থ বলিতেছি, তাহারা উদ্দেশ্যহীন অথবা লক্ষ্যশূন্য হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সজীব পদার্থসকল উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে,—এবং এই উদ্দেশ্যই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে আমাদের উপকারে আসিয়া থাকে। জীবন্ত বস্তুর ভিতর এমন কতকগুলি অদৃশ্য সত্তা আছেন, যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহারা আমাদিগের উপকার করিয়া থাকেন এবং যখন আমরা তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করি, তখন তাঁহারা আমাদের ক্ষতি করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে যে তিনটী প্রভাবের (influence) কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টী একটী মহতী শক্তি; এই শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক বস্তু বিশিষ্ট আকৃতি ও বিশিষ্ট গুণের সহিত পুষ্ট হইতে বা বিকাশ পাইতে থাকে। যখন আমরা কোন বস্তুকে এই প্রকারে পুষ্ট হইতে দেখি, তখন বলিয়া থাকি যে, কোনরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে এই প্রকার হইতেছে।

রাসায়নিক সংযোগ এইরূপ অপরিহার্য্য ঘটনার একটী সামান্য উদাহরণ। বিশিষ্ট প্রকারের বীজ রোপণ করিলে কেমন করিয়া বিশিষ্ট প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহা কেমন করিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিহার্য্য ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে,—তাহা যেমন আমরা জানি না, সেইরূপ কেমন করিয়া রাসায়নিক সংযোগ হয়, তাহাও আমরা জানি না। জান্তব রাজ্যেও ঠিক্ এই প্রকারের ঘটনা হইয়া থাকে,—তবে উহা আরও একটু জটিলভাবে সংঘটিত হয়। জন্তুসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, কেবলমাত্র শরীর নহে, জন্তুদের মনও ঐ নিয়মের অন্তর্গত, সুতরাং ব্যাপারটী আরও একটু জটিলতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। সকল সময় এবং সকল স্থানে অশ্বের "মানসিকত্ব" (Mentality) যেমন অশ্বেরই উপযোগী হইয়া থাকে, সেইরূপ বানর কিংবা মনুষ্যের 'মানসিকত্ব' বানর অথবা মনুষ্যের মতই হইয়া থাকে। উহা অপরিবর্ত্তনীয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা কোন প্রাণীকে "অস্বাভাবিক" উপায়ে কার্য্য করিতে দেখি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহার কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক প্রাণীর একটী কক্ষা (orbit) আছে, সে সেই কক্ষায় কার্য্য করিয়া থাকে। পারদকে সঞ্চালিত করিলে, উহার অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়িগুলি যেমন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে চালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বের পূর্ব্বোক্ত মহতী শক্তির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণী তাহার কক্ষায় চালিত হইতেছে। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, যখন আমরা দ্বিতীয় প্রভাব (influence) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি, তখন আমরা আমাদিগকে অবশ্যসম্ভবিতার (necessity) রাজত্বের অন্তর্গত দেখিতে পাই। প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত বস্তুর বিকাশ বা পরিপুষ্টির ক্রম অপরিহার্য্য অথবা অপরিবর্ত্তনীয়,—এই সামান্য তথ্যের উপর জীববিজ্ঞান (Biology) স্থাপিত হওয়াতে জীববিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান (science) বলে। স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়াতে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের মত দৈবেরই (fate) উপাসক।

কর্ম্মবাদ এই দ্বিতীয় প্রভাবকেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। অন্যান্য

জীবন্ত বস্তর ন্যায় মনুষ্যেরও অস্তিত্বের স্বাভাবিক চক্র (cycle) আছে,—ইহাই কর্ম্মবাদের মত। উক্ত চক্র তিনটী উপকরণের সমষ্টি মাত্র, যথা—দেশ, কাল ও কার্য্যকারণের শৃঙ্খল (causation)। যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, কোন জন্তুই তাহার চক্রের(cycle) বাহিরে যাইতে পারে না। যেরূপ কার্য্য করুক না কেন, একটী ইন্দুর কখন একটী পুঁটী মাছে, কিংবা একটী চড়ুই পাখীতে পরিবর্ত্তিত হয় না; ইহা এমন কার্য্য করিতে পারে না, যাহার ফলে ইহা উড়িতে সমর্থ হয়। ইহা ইন্দুর হইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দুর হইয়াই মরে। আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না, যাহার জন্য আমরা এরূপ সন্দেহ করিতে পারি যে,মৃত্যুর পর ইহা মৎস্যে বা পক্ষিরূপে পরিণত হয়। সুতরাং আমরা এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হই যে, মৃত্যুর পর যদি ইহার কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে ইন্দুররূপেই ইহার অস্তিত্ব থাকিবে। মনুষ্যেরও এই প্রকার হইয়া থাকে, মনুষ্যের এমন কোন শক্তি নাই, যাহার দ্বারা কর্ম্ম করিয়া সে দেবতা অথবা দৈত্যে পরিণত হইতে পারে; তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট চক্রের বিকাশের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। গুটী পোকা যেমন প্রজাপতিতে পরিণত হয়, অথবা ব্যাঙাচি যেমন ব্যাঙে পরিণত হয়, সেইরূপ মৃত্যুর পর দেবতা অথবা দৈত্যরূপে পরিণত হওয়া যদি মনুষ্যের চক্রান্তর্গত পরিণতির (Cyclic Development) অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবিনী। গুটিপোকা অথবা ব্যাঙাচিদের নিজ নিজ পরিবর্ত্তনে যেমন কোন হাত নাই, মনুষ্যেরও সেই প্রকার ঐরূপ পরিবর্ত্তনে কোন হাত থাকিবে না,—তবে তাহার এই পর্য্যন্ত হাত থাকিবে যে, সে নিজেকে হয় অতি উত্তম দেবতা, অথবা অতি নিকৃষ্ট দানবে পরিণত করিতে পারিবে। যদি কোন স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা মনুষ্যের অস্তিত্বের চক্র পরিচালিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ অবগত হইতে হইলে সেই নিয়মও অবগত হইতে হইবে। কোন গ্রহের কক্ষা (orbit) নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, যে নিয়ম অনুসারে ইহার গতি হইতেছে, কেবলমাত্র সেই নিয়ম জানিলে যেমন হয় না, উহার সহিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের দ্বারা ঐ গ্রহের যে সকল সংক্ষোভ ও মার্গচ্যুতি (perterbation) হইয়া থাকে, তাহাও যেমন অবগত হইতে হয়, সেইরূপ

মনুষ্যের কক্ষা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কেবল মাত্র তাহার অস্তিত্বের স্বাভাবিক নিয়ম অবগত হইলে চলিবে না, অন্যান্য যে সকল প্রতিবন্ধকতা দ্বারা তাহার পশ্চাদ্‌গতি ঘটিয়া থাকে, তাহাও অবগত হইতে হইবে। ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা আমাদের তৃতীয় প্রভাবের অন্তর্গত; প্রত্যেক জন্তু নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই কারণ হইতে ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে নিয়মের দ্বারা মনুষ্যের কক্ষা পরিচালিত হয়, তাহাই আমাদের প্রথমে অন্বেষণ করা উচিত।

কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মটার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, আমরা এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না, যাহার দ্বারা আমাদের সাহায্য হইতে পারে। আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বৃদ্ধ হইতে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা এইরূপ অবধারণ করিয়া থাকি যে, আমরাও বৃদ্ধ হইব এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। অপর ব্যক্তিদের ঘটনা সকল দেখিয়া আমাদেরও নিজের সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমরা মনুষ্যের অস্তিত্বের চক্রসম্বন্ধে এই প্রকার অনেক অনুমান করিয়া থাকি। অরণ্যে বটবৃক্ষসকলের যেমন নিশ্চিত, নির্দ্ধারিত এবং সাধারণ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ শূন্যে যে সকল অসংখ্য গ্রহ ও উপগ্রহাদি পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরও কোন সাধারণ ও নির্দ্দিষ্ট বিকাশ আছে। কার্য্য ও কারণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমরা এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকি যে, এই সকল অসংখ্য গ্রহে যে সকল অসংখ্য জীবনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও কোন সাধারণ নিয়ম অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। আমরা একটী গ্রহ অথবা উপগ্রহের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস অবগত নহি, অথবা যে সকল জীবন্ত বস্তু ইহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যের শেষ অংশও অবগত নহি; যদি আমরা উহা অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য কিরূপ হইবে, তাহা কতকটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাম। কিন্তু সেইরূপ পারি না বলিয়াই, আমরা এসম্বন্ধে অনেক অনুমান করিয়া থাকি এবং বলিয়া থাকি যে, এই সকল অনুমান বা মত উন্নত সত্তা কর্ত্তৃক কথিত অভিব্যক্তি (Supposed Revelations) মাত্র। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ বিশ্বাসের উপর আমাদের মতগুলি স্থাপিত। সত্য কথা বলিতে গেলে, কথংবাদ অজ্ঞাত বাদের ন্যায় সত্যের কাছা-

কাছি একটা 'আন্দাজ' মাত্র। তবে, কতকগুলি 'আন্দাজ' সত্যের নিকটে থাকে এবং কতকগুলি 'আন্দাজ' সত্য হইতে দূরে থাকে। কিন্তু কর্ম্মবাদ সত্য হইতে দূরে পতিত হয় নাই, কারণ আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, প্রকৃতি যে পথে কার্য্য করিতেছে, কর্ম্মবাদও ঠিক্ সেই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ,মনুষ্য কর্ম্মবাদকে কারণত্বের (causation) সর্ব্ব সাধারণ নিয়ম মানিয়া থাকে। মনুষ্য এমন ভাবিতে পারে না যে, একটী কার্য্য আছে, অথচ তাহার কোন কারণ নাই, অথবা একটী কারণ আছে, অথচ তাহার কোন কার্য্য নাই। তুলাদণ্ডের এক পাত্রে ভার চাপাইয়া অন্য পাত্রে সমান ভার চাপাইলে, তুল্য ভার বশতঃ যেমন উহারা প্রতিহত (counteract) হয়,সেইরূপ কোন একটী কার্য্যের যে কারণ থাকে, সেই কারণের বিপরীত কারণের দ্বারা কার্য্যকে প্রতিহত করা যায়। অর্থাৎ দুইদিকে সমান ভার চাপাইলে, যেমন কোন দিকে ভার নাই এইরূপ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দুইটী বিপরীত কারণের দ্বারাও কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে না, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, প্রত্যেক ওজন তাহার উপযোগী কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহাদের উভয়ের ভার তুলাদণ্ড বহন করিয়া থাকে। কর্ম্মবাদের প্রথম স্বীকার্য্য (postulate) এই যে, আমরা চিন্তা, বাক্য অথবা কার্য্যের দ্বারা যে কোন গতি উৎপন্ন করি না কেন, তাহাদের যথার্থ ফল ফলিবেই। একটী মন্দ কার্য্য করিলে আমরা যেরূপ শাস্তি ভোগ করিব, একটী সৎকর্ম্ম করিলেও সেইরূপ পুরস্কৃত হইব,—সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করি বলিয়া, আমরা আমাদের কর্ম্মের স্বাভাবিক ফলকে 'পুরস্কার' অথবা 'শাস্তি' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। কারণত্বের (causation) অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'পাপের মার্জ্জনা' (forgiveness of sin) বলেন, তাহা কখন হয় না, বা হইতে পারে না। একটী কারণকে তাহার স্বাভাবিক কার্য্য হইতে বিরত করার নামই পাপের মার্জ্জনা; কিন্তু এইরূপ হইতে গেলে দেশ, কাল ও কারণতার পরিবর্ত্তন হওয়ার প্রয়োজন,— দুয়ে দুয়ে যোগ করিলে পাঁচ হয়,—আমরা যেমন এইরূপ ধারণা করিতে পারি

না, সেইরূপ আমরা পূর্ব্বোক্ত রূপ দেশকালাদির পরিবর্ত্তনের ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা এরূপ ভগবানের কল্পনা করিতে পারি বটে যে, আমরা যদি কোন ক্ষতি করি, তাহা হইলে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে মন্দকার্য্যের কর্ম্মফল ভগবানের স্কন্ধে পড়ে—যেমন দুইটা পাত্রে সন্ন্যস্ত সমান দুইটী ওজনের চাপ তুলাদণ্ড সহ্য করে, সেইরূপ পিতার নামে 'হ্যাণ্ড্নোট্' জাল করিলে, পিতা সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সন্তানকে মন্দফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সন্তানের দোষ ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাকে সেই 'হ্যাণ্ড্নোট্' নিজের স্বাক্ষরিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্ম্মবাদে জমাখরচের বাদ নাই, অর্থাৎ শুভ ও অশুভ ফল বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ করিতে হইবে,—এইরূপ শিক্ষা কর্ম্মবাদ হইতে পাওয়া যায় না; প্রতিহত ওজন দুইটীর মত জমা ও খরচ উভয়ই কার্য্যকারকের উপর পতিত হইয়া থাকে; তাহাদের প্রত্যেকটীর কার্য্য ও কারণের সহিত অপরের কার্য্য ও কারণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া, তাহাদিগকে পৃথক্ভাবে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমি কোন ব্যক্তিকে জলমগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার করি, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যের শুভ ফলের জন্য, আমি যদি কাহাকে হত্যা করি, তবে তাহাকে জীবিত করিতে পারিব না। আমাদের কর্ম্মের ফল অল্পে অল্পে পরিপক্ব হইতে থাকে এবং যে সময়ের ভিতর কোন কর্ম্মের ফল পাওয়া যায়, সেই সময়ে আমরা অন্যান্য অনেক কর্ম্ম করিয়া থাকি; ইহাদেরও ফল আমরা ক্রমশঃ পাইয়া থাকি। মনুষ্যের শরীরের যদি ক্ষয় না হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিত, কারণ তাহার জীবন অনন্ত কারণ ও কার্য্যের দ্বারা অন্যোন্যভাবে সংযুক্ত থাকিত। কর্ম্মবাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, কেহ কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারে না। আমরা মৃত্যুর দ্বারা ভবিতব্যতার (fate) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই না, পুনরায় যখন এই পৃথিবীতে আসিব, তখনও আমাদিগকে পূর্ব্বের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কর্ম্মবাদে আমরা আরও অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যকে যে এই পৃথিবীতে আসিতে হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী—এই অভাব সমর্থনের অথবা ব্যাখ্যার দ্বারা অন্ত মিলিবে না;

সুতরাং যাহা বাস্তবিক ঘটনা, তাহারই আমরা উত্তর চাই ; আমাদের কর্ম্মিক ঋণের জন্য পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসা সুখকর অথবা ন্যায়ানুমোদিত কি না, তাহা দেখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, পৃথিবীতে এইরূপে যথার্থই আসিতে হয় কি না,—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করা উচিত।

কর্ম্মবাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, মনুষ্য বার বার এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এইরূপ আসা সম্ভবপর কি না ? কোন বিষয়ের আদর্শ (standard) না থাকিলে, আমরা সেই বিষয় সম্ভবপর কি অসম্ভবপর বলিতে পারি না। উপরে যে আদর্শের কথা উল্লিখিত হইল, উহা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে গঠিত করিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা নাই, যাহাতে আমরা আদর্শ (standard) গঠিত করিতে পারি, সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার্য্যের (postulate) আশ্রয় লইতে হয়। যাহাদিগকে আমরা মানিয়া থাকি, তাহাদিগের (authority) নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, আমরা উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্যেরা কোন্ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের বিচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখা যাউক। তাঁহাদের মতে মনুষ্য পৃথিবীর ধূলির দ্বারা নির্ম্মিত এবং ঈশ্বর মনুষ্যের শরীরে জীবনরূপী শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত করিয়া আমাদিগকে জীবন্ত প্রাণিরূপে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, মনুষ্যের শরীরই মনুষ্য। বেলুনে যেমন গ্যাস আছে, মনুষ্যের শরীরের ভিতর সেইরূপ আত্মা আছে। আমরা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকি, উক্ত জীবনরূপী শ্বাস ক্রমশঃ উড়িয়া যায় এবং আমাদের শরীর যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের অস্তিত্বের লোপ পায়। ইহা অবগত হইয়া অনেকেই ভীত হন, কিন্তু মৃত্যুর পর অনন্তজীবন লাভ হইবে, এই অঙ্গীকার অনেকটা উৎকণ্ঠা দূর করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদের এই স্বীকার্য্য অনুসারে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যের অস্তিত্ব কোন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ যদিচ্ছাচারী ঈশ্বরের ইচ্ছা বা 'খেয়ালের' দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদের এই স্বীকার্য্য অনুসারে আমরা যে আদর্শ (standard) পাইয়া থাকি, তাহা দ্বারা অনুমান করিতে গেলে, জন্মান্তরবাদ এবং কর্ম্মবাদের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না।

কিন্তু প্রাচ্যেরা শৈশবাবধি বিভিন্ন প্রকার স্বীকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়াতে তাহাদের আদর্শ ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে; তাহাদের স্বীকার্য্য ন্যায়ানুমোদিত, যথার্থ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের মতে মনুষ্যের শরীর নহে, মনুষ্যের আত্মাই যথার্থ মনুষ্য; এবং পরমাত্মা হইতে এই আত্মা সম্ভূত হওয়াতে, ইহার ধ্বংস হইতে পারে না; ইহা অবশেষে পরমাত্মাতেই মিশাইয়া যাইবে; মনুষ্য এই আত্মা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার অপর নাম সংবিৎ। পরমাত্মা সমষ্টি এবং আত্মা সকল ব্যষ্টি মাত্র; যতদিন এই ব্যষ্টিভাব থাকে, ততদিন ব্যক্তিগত সংবিৎ বজায় থাকে। একবিন্দু বৃষ্টির জল সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন মিশাইয়া যায়, সেইরূপ ব্যষ্টি আত্মা সমষ্টি আত্মার সহিত যাহাতে মিশাইয়া না যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক জীব একএকটি কোষ বা আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই কোষ বা আবরণকে,—যাহাকে সংবিতের অধিষ্ঠানভূমি বলা যায়,তাহাকে—আমরা কখন আত্মা বলিতে পারি না। মনুষ্য যখন কলেবর ত্যাগ করে, তখন তাহার গতি কি হয়,—এই সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচ্য দেশীয় সাধারণ ব্যক্তির মত এইরূপ যে, মনুষ্য পাপ করিলে নরকভোগ করে এবং পুণ্য করিলে স্বর্গভোগ করে। মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ কার্য্য করিবে, সেই অনুসারে উক্ত স্থানদ্বয়ে যথাক্রমে শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই দুইটি স্থান জীবনচক্রের ক্ষণস্থায়ি অবস্থা মাত্র। ইহাদেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং পার্থিব লোকের শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের শুভ অথবা অশুভ জন্ম হইয়া থাকে।

কর্ম্মবাদসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এক্ষণে আমাদিগকে প্রাচ্যদের নিম্নোক্ত স্বীকার্য্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগের আদর্শ (standard) ঠিক্ করিতে হইবে। যথা,—মনুষ্য পরমাত্মার অংশমাত্র; মনুষ্যের প্রধান ভাব—সংবিৎ। সংবিতের উক্ত ব্যক্তিগত অংশের ধ্বংস হয় না এবং যতদিন ইহা প্রকাশমান অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ইহা একটি আকার ধারণ করিয়া থাকে। আত্মা যতদিন ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকে, ততদিন উক্ত আধারের ধ্বংস হয় না; কিন্তু এই আধার অত্যন্ত নমনীয়। ইহা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারে বর্ত্তমান থাকে। এই সকল বিভিন্ন অবস্থা,

সংবিতেরও বিভিন্ন অবস্থা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল স্বীকার্য্য ভিন্ন আরও স্বীকার্য্য আছে।

আমরা পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় প্রভাবের কথা বলিয়াছি, তাহার শক্তিপ্রভাবে প্রত্যেক বস্তু বৃহত্তর, যোগ্যতর এবং উৎকৃষ্টতর হইতেছে। ইহাকেই আমরা বিকাশ বা পরিপুষ্টি বলিয়া থাকি; এবং সাধারণতঃ আমাদের মনে ইহাই উদিত হইয়া থাকে যে,মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে,ক্রমশঃ বৃহত্তর,যোগ্যতর ও উৎকৃষ্টতর জীবে পরিণত হইবে এবং অবশেষে তাহার এতদূর উন্নতি হইবে যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ ধারণা আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, কিরূপে এই উন্নতি লাভ হইবে? মনুষ্য কি কোন অধিরোহণীর সাহায্যে,—যে অধিরোহণীর প্রত্যেক সোপানকে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা বলিতে পারা যায়, সেই অধিরোহণী দ্বারা,—কি উক্ত উন্নতি লাভ করিবে? অথবা কোন চক্রাবর্ত্ত-(spiral) মার্গে,—যে মার্গের প্রত্যেক সোপানকে এক একটী বিভিন্ন জীবন বলা যায় এবং যে মার্গের প্রত্যেক চক্রকে এক একটী উন্নততর অবস্থা বলা যায়, সেই মার্গে,—কি তাহার উক্ত উন্নতি লাভ হইবে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রথম মতটী গ্রহণ করেন এবং প্রাচ্যেরা দ্বিতীয় মতটী গ্রহণ করিয়া থাকেন। * প্রাচ্যদের দ্বিতীয় মতটী গ্রহণ করিবার কারণ এইরূপ,—প্রকাশমান অবস্থার গতি (motion) মূল ভিত্তি হইতেছে। সকল বস্তুই গতিশীল এবং যে বস্তুর গতি আছে, তাহা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কোন বস্তুই পরিবর্ত্তনশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। গতি এবং পরিবর্ত্তনের উপর সংবিৎ নির্ভর করিতেছে। কোন একটী বস্তুর গতি তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তুর গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে আমরা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত ও প্রতিঘাত পাইয়া থাকি। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা কম্পন, জোয়ার, ভাঁটা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। যথার্থ বলিতে গেলে প্রত্যেক বস্তু পূর্ণতার দিকে সরল রেখায় ধাবিত হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য কারণের জন্য ঐরূপ সরল পথ হইতে

* মনুষ্যের যত উন্নতি হয়, তত তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রৎ হয়। এই শক্তি "শঙ্খাবর্ত্ত" অর্থাৎ শঙ্খপৃষ্ঠবৎ চক্রাবর্ত্ত (spiral) বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা:—"শঙ্খাবর্ত্তনিভা···সর্পসমা শিরোপরিলসৎ সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ।"
ষট্‌চক্রনিরূপণম্।

প্রত্যেকের বিচ্যুতি ঘটে, সুতরাং কোন বস্তুই সরল রেখায় ধাবিত হয় না। বিচ্যুতির কারণসকল যখন ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে এবং নিয়মমত কার্য্য করে, তখন বস্তুসকলের গতি কক্ষা (orbit) গ্রহণ করিয়া থাকে এবং আমরা তখন বলি যে, ইহারা নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে। যখন এমন কোন বাধা বা বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, যাহার জন্য আমরা কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তখন আমরা ইহাকে ইন্দ্রজাল বা স্বতঃউৎপন্ন বস্তু বলিয়া থাকি। যে দ্বিতীয় প্রভাবের জন্য প্রত্যেক বস্তু পরিপুষ্ট হইতেছে, বাধা ও বিঘ্নের দ্বারা সেই প্রভাবটির বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্য উক্ত পরিপুষ্টি বা বিকাশ, পুষ্টি (growth) ও ক্ষয়রূপ পর্য্যায়ক্রমিক চক্র গ্রহণ করিয়া থাকে। সংবিতের প্রত্যেক অণুর (unit) এই প্রকার চক্রবৎ পুষ্টি ও ক্ষয় সম্পাদিত হইতেছে। ইহার ফলে প্রত্যেক বস্তুর নিজ নিজ চক্রাকার (spiral) গতি হইয়া থাকে। ইহাদিগকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন যায় না। এই সকল ব্যষ্টিবস্তুর গতি সমষ্টিবস্তুর চক্রাবর্ত্ত গতির অন্তর্গত। ব্যষ্টির গতি সামান্য এবং সমষ্টির গতি অতি বিশাল। এই প্রকারে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চক্রের মধ্যে চক্র, গতির মধ্যে গতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই চক্রাকার স্পন্দন (cyclic vibration) বলা হয়; ইহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মার শ্বাস প্রশ্বাস বলা হইয়াছে,—প্রশ্বাসের দ্বারা প্রকাশশীল অবস্থা বা সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং শ্বাসের দ্বারা প্রলয় হইয়া থাকে। প্রাচ্য মতানুসারে মনুষ্যের জীবন, ঐশ্বরিক জীবনের অর্থাৎ উক্ত মহতী গতির সামান্য অংশমাত্র। যে মহাচক্রাকার (cyclic) গতির দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয়, পুষ্টি ও ধ্বংস সাধিত হইতেছে, সেই গতির সামান্য অংশকে মনুষ্যের জীবন বলে। মনুষ্যের অস্তিত্ব যদি উক্ত কম্পনশীল (vibratory) অর্থাৎ চক্রাকার (cyclic form) ধারণ না করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত বলিব। জন্মান্তরগ্রহণই মনুষ্যের চক্রাকার গতি (cyclic motion) এবং যে নিয়মের দ্বারা উক্ত গতি সম্পন্ন হইতেছে, তাহাকেই কর্ম্ম বলে। ইহা ভিন্ন আমাদের আরও স্বীকার্য্য আছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদসম্বন্ধে আদর্শ বা মান (standard) প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাচ্যেরা আর একটী স্বীকার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেমন এক একটী করিয়া ক্ষুদ্র ইষ্টকসকলের সমষ্টি দ্বারা একটী বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ এক একটী করিয়া সমুদয় মনুষ্যের সমষ্টি দ্বারা একটী মহান্ মনুষ্য গঠিত হইয়াছেন। তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রে 'মনু' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবালিষ্টেরা (Cabalists) ইহাকেই Adam Kadman বলিয়া থাকেন। ব্যষ্টিরূপ উপাদানসমূহের দ্বারা সমষ্টি উৎপন্ন হয়, এই স্বীকার্য্যের উপর উক্ত মতটী স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমরা পৃথক্‌ভাবে ব্যষ্টির আলোচনা করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যষ্টিদের যেরূপ গতি হয় হউক, মোটের উপর তাহাদের কোন ক্ষতি না হইলেই যথেষ্ট; কিন্তু সমষ্টি ভাবে দেখিলে আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কতকগুলি আল্‌গা ইটকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইলে, পথিমধ্যে তাহারা না ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উহাদের দ্বারা একটী অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, সেই সময় তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিলে উক্ত অট্টালিকার ধ্বংস হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—অর্থাৎ, আমাদের এই ভূমণ্ডলে (globe) যে পরিমাণে শক্তি রহিয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং পরিচ্ছিন্ন (limited), তাহা বহুদিন পূর্ব্বে প্রাচ্যদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল। এই তথ্য হইতে পাশ্চাত্যেরা শক্তির অনপচয়ের নিয়ম (conservation of energy) বাহির করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচ্যেরা এই তথ্য হইতে জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যেরা প্রকৃতির শক্তি লইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রাচ্যেরা মূলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনী শক্তিতে (vital energy), যাহার সামান্য প্রকাশমান অবস্থাকে প্রকৃতির শক্তি বলা হয়,—এই তথ্য খাটাইয়া থাকেন। কারণ, প্রাচ্যদের ধারণা এইরূপ যে, আমাদের এই ভূমণ্ডলে মোট যত টুকু জীবনীশক্তি আছে, তাহা চিরস্থায়িনী এবং স্থাবর, জঙ্গম ও জন্তু, ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে যত টুকু করিয়া উক্ত শক্তি সঞ্চারিত করা হইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ

প্রত্যেক জাতীয় জান্তব রাজত্বের সমষ্টিগত জীবনী শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। মনুষ্যজাতিও এই নিয়মের বাহিরে নহে; সমষ্টির জীবনের দ্বারা, উহার উপাদান—ব্যষ্টি জীবনসকল পরিচালিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের উন্নতি না হইলে মনুর উন্নতি হইবে না এবং মনুর উন্নতি না হইলে মনুষ্যের উন্নতি হইবে না। সমষ্টি মনুষ্যের অর্থাৎ মনুর শরীরের ভিতর প্রত্যেক ব্যষ্টি মনুষ্যের কক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রৎ অবস্থায়, মৃত অথবা জীবিত অবস্থায়, প্রত্যেক মনুষ্য মনুর একটী উপাদানমাত্র; ইহারা মনুর কর্ম্মের ভাগ গ্রহণ করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবের দ্বারা মনু যেমন পুষ্ট ও উন্নত হইতেছে, ইহারাও সেইরূপ পুষ্ট ও উন্নত হইতেছে এবং যখন মনুর নাশ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখন ইহাদেরও নাশ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। আমরা যেরূপ আমাদের মনুর সহিত আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাদের মনুও সেইরূপ মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর একটী অতি বৃহৎ মনুর সহিত আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইঁহাকে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু বলে। মনুসম্বন্ধে এই ধারণা নূতন নহে। মনুসংহিতায় (১—৬১।৬২) উল্লিখিত হইয়াছে :—

"স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎ-সুত এব চ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মার পৌত্র এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অপর ছয় জন মহাতেজস্বী মহাত্মা মনু জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা প্রত্যেকেই প্রজাসৃষ্টি দ্বারা স্ব স্ব বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ ও বিবস্বৎসুত বৈবস্বত,—ইঁহারা সেই ছয় জন মনু। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুকে লইয়া ইহারা সাতজন মনু। এই সাত জন মনু অপর একটী মহান্ মনু হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। মনুসংহিতায় (১-৩০) মনু স্বয়ং বলিয়াছেন যে,—"তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং"—অর্থাৎ আমাকে এই সমুদয় সৃষ্টির দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও। এই মনু হইতেই অপর সাত জন মনুর সৃষ্টি হইয়াছে, যথা,—"এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ", (১।৩৬), অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মনু যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রজাপতি আবার অপর

সাত জন মহাতেজস্বী মনু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সাত জন মনুর প্রত্যেকেই প্রজা সৃষ্টি দ্বারা বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। আমাদের এই পৃথিবীতে যে মনু প্রজাসৃষ্টি দ্বারা বংশবিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার নাম বৈবস্বত মনু। সমুদয় সৃষ্টি যেমন ব্রহ্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, সেইরূপ এই পৃথিবীর সমুদয় প্রজাসৃষ্টি মনুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই প্রকার সাতটী মনু লইয়া একটী মহান্ মনু গঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড যেমন ব্রহ্মার মধ্যে অবস্থিত, পূর্ব্বোক্ত সাতটী মনু সেইরূপ ব্রহ্মার মানস পুত্রের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে।

ছাত্রগণ যখন স্কুলে থাকে, সেই অবস্থার স্কুলের সহিত, পৃথিবীর তুলনা হইতে পারে। ছাত্রগণের অস্তিত্বের উপর স্কুলের অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। স্কুল যে দিন প্রথম খুলিয়া থাকে, সেই দিন যদি ছাত্রগণ স্কুল হইতে পলাইয়া বৈদ্যনাথ, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে আমোদ করিতে যায়, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা অল্প হইয়া যাইবে এবং বাধ্য হইয়া তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক হিসাবে তাহা হয় না; ছাত্রগণ যতদিন ছাত্রপদবাচ্য থাকে, ততদিন তাহারা যথাসময়ে স্কুলে আসিয়া থাকে। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা ঠিক্ পলায়িত ছাত্রের ন্যায় স্কুলে একদিনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মৎস্য শিকার করিতে, অথবা খেলা করিতে পলায়ন করিতে চান। মনুর অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে, যথার্থ—আছে বলিয়া জন্মান্তরগ্রহণ ও কর্ম্মবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্যধর্ম্মপ্রচারকেরা কেবল স্ব স্ব লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে নিজের চেষ্টার দ্বারা এমন পূর্ণ (Perfect) হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে আমরা দেবতাদের সঙ্গে বাস করিবার যোগ্য হইতে পারি; তাহাদের মত এই রূপ যে, আমরা যদি ঐরূপ না করি, তাহা হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিব। যাহারা আমাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দেন, তাহারা একেবারে ভুলিয়া যান যে, ঐরূপ উপদেশের অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র যে প্রভাব ও অবস্থার দ্বারা আমরা মনুষ্যনামে পরিচিত, সেই প্রভাব ও অবস্থা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ইহা একেবারেই অসম্ভব! এইরূপ করিতে গেলে আমরা উন্মত্ত হইয়া যাইব। যদি সমুদয় ব্যক্তি, যাহারা মনুর প্রকাশমান আধার মাত্র, তাহারা সকলে

উন্নত লোকে উপনীত হয়, তাহা হইলে মনুর যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। যদি আমাদের মস্তিষ্কের অথবা যকৃতের কোষ বা 'সেল্‌সকল' (cells) সুস্থ অথবা রুগ্ন বলিয়া পুরস্কৃত অথবা দণ্ডিত হইবার জন্য, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদের মস্তিষ্ক অথবা যকৃতের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের শরীরস্থ 'টিসুসেল্‌সকল' (tissue cells) যদিও ক্রমাগত শরীরে শোষিত অথবা শরীর হইতে বিতাড়িত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের জীবতত্ত্ব (life principle) যাহাকে জীবাত্মা (Ego) বলে, তাহার কখন ধ্বংস হয় না; উহা আমাদের মঙ্গলের জন্য জন্মান্তরগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন উক্ত সেলের ন্যায় আমাদের শরীরের ধ্বংস হয়, কিন্তু আমাদের আত্মা মনুর দেহে বর্ত্তমান থাকে। মনুর মঙ্গলের জন্য উক্ত সেলের ন্যায় আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,—সমুদয় মনুষ্যজাতিরূপ একটী সমষ্টিগত মনুরূপ মহতী সত্তার উন্নতির জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। অসংখ্য ইষ্টকের দ্বারা যেমন 'গভর্ণমেণ্ট হাউস্' একটী সত্তারূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য মনুষ্যজাতির দ্বারা মনুর মহতী সত্তা গঠিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যেরা মনু অর্থাৎ বিরাট্ মনুষ্যের (universal man)—যিনি আমাদের সকলের ভিতর রহিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার ভিতর রহিয়াছি, তাঁহার—প্রয়োজন আছে কি না, তাহা জ্ঞাতসারে বিশ্বাস না করিলেও, অজ্ঞাতসারে মনুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নত যুগপরম্পরার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে,—প্রথমে, 'প্রস্তর যুগ' (stone age) 'ব্রঞ্জ যুগ' (bronze age) 'লৌহযুগ' (iron age) এবং এক্ষণে 'এলুমিনিয়ামের যুগ' (aluminium age) পড়িয়াছে—প্রথমে মনুষ্যশক্তির, পরে অশ্বশক্তির, ক্রমে বাষ্পীয় শক্তির এবং অবশেষে তড়িৎ-শক্তির যুগ আসিয়াছে। এক এক যুগে পাশ্চাত্যদের এক এক প্রকারের আসক্তি লক্ষিত হইয়াছিল; যথা, ধর্ম্ম, যুদ্ধ, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা যথাক্রমে এক একটী বিষয় এক এক যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যেরা যখন পূর্ব্বোক্ত উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিকে

লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত জাতি ও সমষ্টিগত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন।*

পাশ্চাত্যেরা বলিয়া থাকেন যে, 'অমুক অমুক যুগে আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই প্রকার ভাব আসিয়া থাকে, যেমন ধর্ম্মভাব, যুদ্ধভাব প্রভৃতি।' আবিষ্কারকর্ত্তাও বলিতে পারেন না যে, তিনি কেমন করিয়া আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তিনি নিজে কোন চেষ্টা করেন না, নিজেকে কেবল আধার করিয়া থাকেন মাত্র, এবং তখন ভাব সকল (ideas) আপনি আসিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্যক্তিবিশেষের সংবিৎ অপেক্ষা একটী উচ্চতর সংবিতের বিকাশ—যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের সংবিৎ নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার বিকাশ—না থাকিলে, কেমন করিয়া তাঁহাদের আকস্মিক প্রত্যাবভাস (inspiration) হইতে পারে? এই সকল ঘটনাকে আমরা কারণত্বের (causation) ভিতর অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কর্ম্মফলের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি না। জাতীয় কর্ম্মফলে সভ্যতাবিস্তারের জন্য আমরা যে সকল সুখ উপভোগ করিতেছি, তাহার জন্য কেবল মনুই ধন্যবাদের পাত্র। মনু প্রকৃতির বিশেষ আদরের সামগ্রী এবং যে সকল উপাদানে মনু গঠিত হইয়াছেন, তাহারাও প্রকৃতির নিকট যত্ন পাইয়া থাকে। মনুর কর্ম্মফলের এবং মনুর পরিপুষ্টির অংশ আমরা যদি গ্রহণ না করিতাম এবং যদি তাঁহার সহিত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর না হইতাম, তাহা হইলে আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইতাম এবং আহার ও পুত্রোৎপাদন ভিন্ন আর কিছুরই চিন্তা করিতাম না; কারণ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটী মহতী সত্তা মনুর উপর অত্যন্ত বলবতী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ও ধ্রুব নিয়মসকলঅনুসারে—যে সকল নিয়মকে প্রাচ্যেরা জন্মান্তরগ্রহণ ও কর্ম্মের নিয়ম বলিয়া অবগত আছেন, সেই সকল নিয়ম অনুসারে—মনুর পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সকল স্বীকার্য্যের কথা বলা হইল, তাহাদের উপর প্রাচ্যেরা

* গ্লাডষ্টোন জাতিগত কর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন। মর্লি (Morley) সাহেব গ্লাডষ্টোনের জীবনীতে উক্ত মহাত্মার ডায়েরী উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন,—"I am in dread of the judgment of God upon England for our natural inequity towards China."

তাঁহাদের সম্ভবত্বের মান বা আদর্শ (standard of probabilty) স্থাপিত করিয়া থাকেন এবং এই মান হইতে দেখিতে গেলে জন্মান্তরবাদ ন্যায়ানুমোদিত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের নিয়ম অনুসারে জন্মান্তরগ্রহণ পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মের নিয়মও অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। কম্পনশীল (vibrating) অথবা চক্রাকার (cyclic) গতির দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটি—যাহার দ্বারা প্রত্যেক বস্তু পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা— চালিত হয়। প্রথম প্রভাবের ন্যায় দ্বিতীয় প্রভাবটীও আমাদিগকে আর এক প্রস্থ বিভিন্ন কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মের নিয়মের দ্বারা সমুদয় প্রকৃতির পরম্পরাবিরুদ্ধ গতির ব্যাখ্যা করিতে গেলে,আমাদিগকে উক্ত কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলও ধরিতে হইবে। উক্ত চক্রাকার গতির দ্বারা ক্রমবিকাশ এত অল্পে অল্পে সম্পাদিত হইতেছে এবং প্রায় ইহার এমন ভয়ানক বিপরীত গতি (retrogression) হইয়া থাকে যে, ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য (personal consideration) বাদ না দিলে, ইহা উন্নতির দিকে যাইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারিব না। যখন আমরা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য বাদ দিয়া উচ্চতর ভূমি হইতে দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে,ক্রমবিকাশ একটী বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাতে ন্যায় বিচারের (justice) কথা কিছুই আসে না। যদিও প্রকৃতির এই মহতী শক্তি 'অন্ধ' (blind) নহে, তথাচ ক্রমবিকাশের ভিতর যে অবশ্যম্ভাবিতা অথবা অভিসন্ধি রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। যে প্রভাবকে প্রত্যেক জীবিত প্রাণী নিজে নিজের উপর প্রয়োগ করিতেছে, প্রত্যেকে তাহাদের প্রকৃতিঅনুসারে কার্য্য করিতেছে ও নিজের কল্যাণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সেই তৃতীয় প্রভাব-সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিব, তখনই ন্যায়-বিচারের (Justice) কথা উত্থিত হইবে। মনুষ্যের ঐ প্রকার স্বার্থপর কার্য্য অন্যায় ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং অন্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, মনুষ্যের ন্যায়ের (Justice) ধারণা হইতে পারে না। ন্যায় বিচারকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যতত্ত্ব (ruling principle) করিলে কেবল যে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবকে বাদ দিতে হয় তাহা নহে, প্রথম প্রভাব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা অবশ্যম্ভবিতাকেও বাদ দিতে হয়। ন্যায়-বিচারকে (Justice) যদি আমরা মুখ্যতত্ত্ব বলিয়া ধারণা করি, তাহা

হইলে ঈশ্বরকে সগুণ বা বিগ্রহবান্ (personal) ঈশ্বর বলিতে হয় এবং ঘড়িওয়ালা যেমন ঘড়ি প্রস্তুত করে, ঈশ্বর সেইরূপ আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঘড়িওয়ালার যেমন বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে,—যেমন পছন্দ ও অপছন্দ প্রভৃতি, ঈশ্বরেও সেইরূপ গুণ আছে,—এইরূপ মানিতে হয়। ঈশ্বরকে যদি আমাদের ন্যায় পছন্দ ও অপছন্দবিশিষ্ট সত্তা বলিতে হয়, অর্থাৎ যদি তাঁহার শুভাশুভের ধারণানুসারে সকল বিষয় ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্ট ও ক্রমবিকাশকে বাদ দিতে হয় এবং দুয়ে দুয়ে একত্র করিয়া পাঁচ হয়—এইরূপ বলিতে হয়। প্রাচ্যেরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে এইরূপ কিছুই ভাবেন না এবং যেখানে ন্যায়ের (Justice) কথা উত্থাপন করিবার কোনও কারণ নাই, সেখানে ন্যায়ের কথা উত্থাপন করেন না। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ ঐশ্বরিক ন্যায়ানুমোদিত কি না, তাহার নিষ্পত্তির জন্য যে বাদানুবাদ হইয়া থাকে, তাহা প্রাচ্যদের নিকট 'পলাবাজি' বলিয়া বোধ হয়।

বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাপন্ন অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য জীব,—যাহারা নিজেদের সুবিধা ও প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা—যে সকল চেষ্টা (Compulsion) প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাই তৃতীয় প্রভাব এবং যখন তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই ন্যায়ের কথা উত্থিত হয়। জীবগণের ভিতর দেবতাদিগকে ধরিতে হইবে কারণ, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার (Justice) মানবীয় ন্যায়-বিচার হইতে পৃথক্ নহে,—ন্যায়বিচার একই প্রকারের হইয়া থাকে। এই ন্যায়বিচারপ্রকটনের জন্য পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট ভূমিতে (plane) প্রকাশ পাইবে বলিয়া ঐশ্বরিক গুণসকল যখন বিভিন্ন আধার গ্রহণ করে, তখন ঐশ্বরিক গুণসকল আধার ও ভূমির দ্বারা প্রতিহত হয়। পাশ্চাত্যেরা পরমাত্মা ও পরমাত্মার বিকাশসকলের ভিতর কোন পার্থক্য করেন না বলিয়াই, কর্ম্মবাদ বুঝিতে এত গোলযোগ করেন। মনুষ্যের পরিচ্ছিন্ন মন কখন পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের কল্পনা করিতে পারে না, ঐ রূপ কল্পনা করিতে গেলে হয় মায়োপাহিত ঈশ্বরের অথবা মহাসত্তা কোন দেবতার কল্পনা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর

বলেন, তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট পরব্রহ্মের উচ্চতম বিকাশমাত্র,—উহা নিজে কখন পরব্রহ্ম হইতে পারে না। প্রাচ্যদের এই পরব্রহ্মের কল্পনা পাশ্চাত্যধর্ম্মাবলম্বীদের মস্তিষ্কে উদিত হয় না। পাশ্চাত্যেরা যে মহতী সত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রাচ্যেরা সেইরূপ এক একটী সত্তার পূজা করেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিবে বলিয়া তাঁহাদের পূজার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হয়, তখন তাঁহারা ঐরূপ এক একটী সত্তার পরিবর্ত্তে পরব্রহ্মেরই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

পরমাত্মার বিকাশসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের কিরূপ ধারণা, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, পরব্রহ্মের একটীমাত্র বিকাশ আছে, তাহাকে তাঁহারা 'গড্' বলেন; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদের 'গডের' ন্যায় অনেক দেবতাতে পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সকল দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাযুক্ত—ইহারা সকলে বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট। প্রাচ্যেরা ইহাদের মধ্যে একটিকে অথবা দুই চারিটিকে পূজা করিয়া থাকেন। দুইটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রাচ্য মতানুমোদিত এই সকল মহাসত্তাসমূহ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। যখন আমরা বহির্মুখী দৃষ্টিতে দেখিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্যদের 'গড্' সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, এই সকল দেবতা-সম্বন্ধেও প্রাচ্যদেরও সেইরূপ ধারণা, তাঁহারা মনুষ্যদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং মনুষ্য যাহা করিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এবং যথা-সময়ে মনুষ্যকে শাস্তি দিতেছেন। কিন্তু যখন অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতারা বিভিন্ন সত্তামাত্র এবং এক একটি মনুষ্য উহাদের একটি উপাদানমাত্র। তাঁহারা মনুষ্যের উচ্চতম অংশ (Higher Self)-মাত্র। দেবতাদের সমষ্টিকে আমরা মায়োপাহিত ঈশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া থাকি,—মনুষ্য ও দেবতা এই মহতী সত্তার বিভিন্ন উপাদানমাত্র। এই প্রকার দুইটি ভিত্তিমনুসারে মনুষ্য পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, আমরা পরমাত্মার ভিতর রহিয়াছি; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, কেবল তাহাই নহে, পরমাত্মাও আমাদের ভিতর রহিয়াছেন এবং আমাদের ভিতর দিয়া তিনি কষ্ট অথবা সুখ অনুভব

করিতেছেন। সুতরাং আমরা যখন অপরের অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া থাকি, তখন আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরেরই ক্ষতি করিয়া থাকি। কিন্তু এই উভয় স্থলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, সেই শাস্তি অথবা কর্ম্মফল আমাদেরই স্বকৃত। এই তৃতীয় প্রভাবের দ্বারা যখনই আমরা ক্ষতি করিতে যাই, তখনই আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি করিয়া থাকি; এই প্রকার ক্ষতির দ্বারা আমরা প্রত্যেক বার কিছু লাভ করিয়া থাকি। আমরা যদি কেবলমাত্র তৃতীয় প্রভাবের আলোচনা করি, তাহা হইলে কর্ম্মবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রভাবই কর্ম্মবাদের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের এমন একটি নিয়ম থাকা চাই, যাহার দ্বারা উক্ত তিনটি প্রভাবেরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। তাহা না হইলে আমরা ভগবানের 'গুপ্ত অভিপ্রায়' অথবা 'অভিসন্ধি' অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হইব। পূর্ব্বোক্ত যে তিনটি প্রভাব আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে, কর্ম্মফলের নিয়ম তাহাদিগকে কিরূপে সামঞ্জস্য করে, তাহা দেখা যাউক।

প্রত্যেক ব্যক্তির পরলোক, তাহার ইহলোকের প্রতিফলন (Reflex) মাত্র। একটি থলির ভিতরটা যেমন টানিয়া বাহিরের দিকে আনিতে পারা যায়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদেরও ভিতরটা বাহির হইয়া আসিয়া থাকে—তখন যাহা অন্তর্মুখী (Subjective) ছিল, তাহা বহির্মুখী (Objective) হইয়া থাকে। আলোকচিত্র (Photography) লইবার সময় যেমন কাচের উপর ঋণ (Negative) চিত্র অঙ্কিত হয়, সেইরূপ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ঋণ (Negative) চিত্রসকল অজ্ঞাতসারে চিত্রিত করিতেছি এবং আমাদের অনুদ্বুদ্ধ স্মৃতিতে (Sub-conscious memory) ঐ সকল চিত্রকে সঞ্চিত করিতেছি,—ইহারা ক্রমশঃ আমাদের বাহ্য (Objective) জগতে পরিণত হইতে থাকে। আমরা যখন ইহলোক ত্যাগ করি, তখন আমরা, ঐ সকল চিত্র আমাদের সঙ্গে লইয়া যাই এবং 'ম্যাজিক লাণ্ঠানের' দ্বারা চিত্রিত চিত্রসকলকে যেমন বাহিরে প্রতিফলিত করা যায়, সেইরূপ পরলোকে আমরা উক্ত চিত্রসকলকে আমাদের বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, চিন্তার এই সকল প্রতিফলন জীবন্ত চিত্রমাত্র; স্বপ্নসকল

যেমন নূতন নূতন সংযোগ প্রস্তুত করিয়া,নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া থাকে,আমাদের অন্তর্দ্ধ (Sub-conscious) স্মৃতিসকল তেমনই আমাদিগকে স্বপ্নের স্থূল উপাদান যোগাইয়া থাকে। মনের ভাবসম্বন্ধে ধরিতে গেলে, আশা অপেক্ষা ভয় একটি অত্যন্ত বলবান্ ভাব, সেই জন্য মৃত্যুর পর ভয়ানক খেয়ালসকল প্রথমেই স্থূলীভূত (Materialize) হইয়া থাকে; তখন আমাদের মন আমাদের অতীতের মন্দ কর্ম্মসকলকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং আমরা তখন যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু ক্রমশঃ অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভয়ের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া আশার মূর্ত্তিসকল আবির্ভূত হয়, তখন মন্দ ভাবসকলের পরিবর্ত্তে শুভ ভাবসকল উদিত হইয়া থাকে; আমরা তখন বিশুদ্ধ হইয়া থাকি এবং সুখী হই। আমাদের ইহলোক যেমন আমাদের নিকট বাস্তব, আমাদের পরলোকও সেইরূপ আমাদের নিকট বাস্তব,—তবে উহা অন্য প্রকার অবস্থা দ্বারা গঠিত। যাহাদিগকে আমরা 'মৃত' বলিয়া ধার্য্য করিয়া থাকি, তাহাদিগকে পরলোকে জীবিত, চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম দেখিতে পাইব,—তবে আমাদের অবস্থা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অন্য প্রকারের হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি সময়-বিশেষের জন্য আমাদের অবস্থা গ্রহণ করিয়া যে আমাদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

অনেকে বলেন যে, মৃত ব্যক্তিরা আমাদের অপেক্ষা সুখী। কারণ, তাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিলেই যে, লোকের সুখ হয়, তাহা নহে; কিংবা আমাদের পরিপুষ্টি (Growth) হইলেই যে, আমরা সুখী হইব, তাহা নহে। যে বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত, সেই বিষয় আমাদের উপযোগী হইয়া থাকে। স্কুলে আবদ্ধ জনৈক 'টেরিকাটা' আদুরে ছেলে অপেক্ষা, দরিদ্রের শতগ্রন্থিবস্ত্রবিশিষ্ট এবং ধূলা-কাদা-মাখা মূর্খ ছেলে স্বাধীন বলিয়া, শতগুণে সুখী। স্বার্থপরতা এবং পাশবিক গুণের ভিতর নিমজ্জিত, স্বার্থপর এবং পাশবিক প্রকৃতির ব্যক্তি, সদ্‌গুণের মধ্যে নিমজ্জিত, স্বার্থশূন্য এবং পবিত্র ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সুখী। কারণ, স্বার্থপর ব্যক্তি অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা পৃথিবীর কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন। পরলোক ইহলোকের অবিকল প্রতিফলন এবং

মনুষ্য যখন পরলোকে যায়, তখন তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। এই হেতু, মনুষ্য যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন তাহাকে তাহার পূর্ব্বের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহাকে একেবারে অবশ করা হয় মাত্র। যাহারা মৃগয়া ভালবাসে, তাহারা মৃগয়া করিবার জন্য পরকালে নানাপ্রকার জীবজন্তুবিশিষ্ট বন উপবন পাইবে, উকিলেরা মক্কেল পাইবে, ডাক্তারেরা রোগী পাইবে, পুরোহিত যজমান পাইবে এবং কৃপণ ধন পাইবে।

ভাল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য 'ছোট লোকের' ছেলেকে ধৌত করিলে এবং স্কুলে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন কষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটী আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য, যখন আমাদিগকে পূর্ব্বের অভ্যস্ত সুখের অবস্থা হইতে নূতন অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, তখন আমাদিগকে ঐ নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হইতে পূর্ব্বরূপ কষ্ট অনুভব করিতে হয়। মৃত্যুর পর আমরা আমাদের অন্ধবিশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি আবর্জ্জনা,—যাহাকে আমরা ইহলোকের বিদ্যা ও শিক্ষা বলিয়া থাকি,—ত্যাগ করি; এই প্রকারে আমরা যখন ধৌত হই, তখন আমরা নিষ্কলঙ্ক হইয়া থাকি এবং পুনরায় শিশু হইবার যোগ্য হই। যদি দ্বিতীয় প্রভাবটী না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্ত হ্রাস ও বৃদ্ধি, শিক্ষা ও ভুল, জীবিত অবস্থায় কঠিন এবং মৃত অবস্থায় নমনীয় হইত না। অনন্ত কাল ধরিয়া মনুর উন্নতি হইতেছে। যেমন ঘাড়ে ক্রমাগত বোঝা চাপাইলে আমরা বলবান্ হই না, সেইরূপ ক্রমাগত শিক্ষার দ্বারা আমরা জ্ঞানী হই না। ৩০ বৎসরের একটি যুবা ১০ বৎসরের একটি বালক অপেক্ষা অধিক ভার বহন করিতে পারে। কেমন করিয়া ভার বহন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যে, ঐ ব্যক্তি বেশীভার বহন করিতে পারে, তাহা নহে; ঐ ব্যক্তি পুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ভার বহন করিতে সমর্থ হয়। বিষয়-সকলের ভিতর কি সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিতে পারিলেই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঘটনাসকলের দ্বারা বিষয়সকলের সম্বন্ধ আমাদিগের অনুভূত হইয়া থাকে। ঘটনাসকল লক্ষ্য করিয়া আমরা সম্বন্ধের অনুভূতি পাইয়া থাকি এবং তাহাতেই আমরা পুষ্ট (grow) হইতে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) ও অনুরাগের (emotion) ভিতর আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিবার

ক্ষমতা মানবজাতিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে মনের একটি নূতন গবাক্ষ উন্মুক্ত হওয়াতে, সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সকলের সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করা সম্ভবপর হইতেছে। কি প্রকার অবস্থায় আমাদের সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি ; পরিপুষ্টির (growth) দ্বারা আমাদের বুদ্ধি এবং সহানুভূতির বিকাশ না হইলে, আমরা কোন ক্রমে সুখী হইব না। ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, কলা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বিকাশের ফলমাত্র, কারণ নহে। মনুষ্যজাতির স্নায়বিক শক্তি (nervous energy) পূর্ব্বোক্ত আকারে স্বতঃ ব্যয়িত হইতেছে। মনুষ্যজাতি বুদ্ধিবৃত্তির ও সহানুভূতির কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা পাওয়াতে ঐ প্রকার স্বাভাবিক ফলসকল উৎপন্ন হইয়াছে,—এই প্রকার সূচিত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জন্মান্তরশীল জীব পুষ্ট হইতে থাকে এবং যে সকল বিষয় হইতে ইহা অভিজ্ঞতারূপ সার অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের অসার অংশ ত্যাগ করা প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনের জন্যই জন্মান্তরের আবশ্যকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা জন্মান্তরগ্রহণ মানেন না, তাঁহারা এক প্রদেশের অভিজ্ঞতার উপর পরবর্ত্তী প্রদেশের অভিজ্ঞতা চাপাইয়া, অভিজ্ঞতাকে আকাশপ্রমাণ উচ্চ করিতে যাইয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন মাত্র,—আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতে হইলে উদরে কেবল আহারের বোঝা চাপাইলে চলিবে না. অসার অংশের ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। সেই প্রকার এক রাজত্বের অভিজ্ঞতার উপর অন্য রাজত্বের অভিজ্ঞতা চাপাইলে চলিবে না। এক রাজত্বের অভিজ্ঞতা অন্য রাজত্বে চলে না, জন্মান্তরগ্রহণ না মানিলে হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ভুলসকল শোধন করিতে হইবে, না হয় পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা ত্যাগ করিতে হইবে,—কিন্তু এইরূপ করা অতীব কষ্টসাধ্য ; দেবতারাও এইরূপ করিতে চাহিবেন না ; কারণ একটী বিষয় শিক্ষা করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞাত বিষয়কে স্মৃতি হইতে তাড়িত করা অতীব দুরূহ। কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণ দ্বারা অসার অংশ ত্যক্ত হইয়া থাকে ; অতীত জন্মের দুঃখ, কষ্ট, পাপ, এবং অন্ধবিশ্বাস এবং অতীত জন্মের স্মৃতি, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, জন্মান্তরগ্রহণের দ্বারা মুছিয়া যায় ; কিন্তু—উহাদের স্মৃতি যদি বজায় থাকিত, তাহা হইলে যথার্থ উন্নতি এবং পরিপুষ্টি হওয়া অসম্ভব হইত।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাব যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সেই নিয়মের দ্বারা যখন জীবাত্মা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার অতীত কর্ম্ম তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য যে সকল পাপ করিয়াছে, সেই সকল পাপ যদি অনুতাপের দ্বারা ভস্মীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার (Divine justice) অনুসারে মনুষ্য দণ্ডিত হইবে; দণ্ড-ভোগের নিমিত্ত তাহাকে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যে, সেখানে তাহাকে কষ্টভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু যদি ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারসম্বন্ধে বিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যতদূর অমানুষিক কার্য্যের পরিচয় হইতে পারে, তাহা হইয়া থাকে। কারণ, তখন যে ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার প্রতি কোন দয়াই প্রকাশ করা যায় না। কারণ, সে পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছে, তাহারই ফলভোগ করিতেছে এবং তাহা হইলে যাহাতে কষ্টভোগী জীব অধিক কষ্টভোগ করিয়া শীঘ্রই কর্ম্মের ক্ষয় করিতে পারে, তাহা যে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিরই ইচ্ছা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারসম্বন্ধে ধারণা অতীব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে নিয়মের দ্বারা আমাদের জন্মান্তরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা যদিও পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবের অন্তর্গত, কিন্তু ঐ নিয়মটী তৃতীয় প্রভাবের দ্বারাও পরিণমিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ, আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাদের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত নহি এবং যাঁহাদিগকে আমরা উপাসনার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারি, সেই সকল মহতী সত্তা ক্রমাগত আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—সকল যুগেই এই মহতী সত্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যার মূলভিত্তি। বিকাশ ও পরিপুষ্টির যে অবস্থায় আমরা রহিয়াছি এবং আমরা যে প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর রহিয়াছি, সেই অনুসারে আমরা যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফল প্রদান করিবার জন্য প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, কতকগুলি দৈববিপাক বা দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন প্রকার পাপ কার্য্যের সংঘটন হওয়া অনিবার্য্য; কিন্তু কোন যুদ্ধের সময় কোন্ সৈনিকটী হত হইবে, সেইজন্য যেমন সেনাপতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কে যে পাপী হইবে এবং কে যে হত হইবে, তাহার জন্য অদৃষ্টের (fate) সহিত

কোন সম্বন্ধ নাই। চতুর্দ্দিকে যে সকল পাপ ও দুঃখ বিরাজ করিতেছে, তাহা বিশিষ্ট জাতির মন্দকার্য্যের ফল। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি পাপকার্য্য করিবে, কিংবা কোন্ ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করিবে, তাহা একপ্রকার 'লটারি'-বিশেষ,—কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ইহা ন্যায়ানুমোদিত 'লটারি'। কারণ, সমুদয় ব্যক্তির দোষ ও গুণ ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোটামুটী হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ ও গুণ একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট। 'লটারিকে' ন্যায়ানুমোদিত করিবার জন্য,—এই স্থানে,—দেবতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। এই দেবতাদিগকে কর্ম্মের অধীশ্বর বা 'লিপিক' বলে।

এই দেবতারা যেন 'লটারির টিকিট' হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। যাহারা উপাসনার দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন, তাহাদিগকে তাঁহারা জোর 'জিতের সংখ্যা'(wining number) দিয়া থাকেন। ইহাই সমুদয় ধর্ম্মের মর্ম্ম। দেবতারা এই পর্য্যন্ত পারেন; ইহার বেশী আর কিছু পারেন না। পূর্ব্বজন্মসমূহে মনুষ্যসকল চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীর কোন উন্নতি করে নাই বলিয়া, তাহাদের পাপ হইয়াছে এবং সেইজন্য জাতীয় কর্ম্মরূপ শাসনদণ্ড দ্বারা তাহারা প্রহার ভোগ করিয়া থাকে। স্বার্থপর ব্যক্তিরা স্যার বয়েল রকের (Sir Boyle Roch) ন্যায় বলিয়া থাকে যে, "আমার বংশধরগণ (Posterity) আমার জন্য কি করিয়াছে যে, আমি তাহাদের জন্য কিছু করিব?" এইরূপ ব্যক্তি যখন জন্মান্তর গ্রহণ করে, তখন সে ব্যক্তি যেরূপ বীজ বপন করিয়াছে, সেইরূপ ফলভোগ করে। কারণ, সে তখন নিজেই বংশধর হইয়া থাকে।

যদি দেবতাদের হস্তক্ষেপের দ্বারা কার্য্যের নিয়ম পরিচালিত হয়, তাহা হইলে এই সকল দেবতারা কে, তাঁহাদের কার্য্যই বা কি প্রকারের, তাহা আমাদিগের অবগত হওয়া উচিত। এই সকল দেবতারা শক্তি বা প্রভাব রূপে আমাদিগের উপর কার্য্য করিয়া থাকে—আমরা উহাদিগকে আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট করিয়া থাকি। এই সকল শক্তি বা প্রভাব কি প্রকার প্রকৃতির, তাহাই আমাদের অবধারণ করিতে হইবে,—উহাদের নামের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা তাহাদের দেবতাদিগের নিকট শত্রুবধের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং যাহাদের দেবতারা মৃত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহাদিগকে যত সুনাম দাওনা কেন, তাহারা

দেবতা নহে, রাক্ষসপদবাচ্য। অন্তঃকরণের যে প্রবৃত্তির দ্বারা মনুষ্য আপন দেবতাকে পূজা করিয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তির যে নাম, তাহার দেবতারও সেই নাম হয়। কার্য্য দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির প্রকাশ করিলেই—বাক্য দ্বারা, সঙ্গীত দ্বারা কিংবা চিন্তা দ্বারা নহে—ঐ দেবতার পূজা হইয়া থাকে এবং তাঁহার অস্তিত্বের অংশ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা আমাদিগের ভিতর যে পরিমাণে কোন বিশেষ বৃত্তিকে—যেমন ন্যায়, দয়া, হিংসা, প্রতিহিংসা, বুদ্ধি, ক্ষমা, পরোপকার ইত্যাদি গুণের মধ্যে একটীকে—দেবতার ন্যায় অনুমান করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণে উক্ত দেবতার সংবিতের অংশ গ্রহণ করিব। ঐ প্রকার দেবতাসমুদয়ের অথবা শক্তি বা প্রভাবের সমষ্টিকে ঈশ্বর বলে। ইঁহাতে সৃষ্টি অথবা প্রলয়ের উভয় গুণই বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইঁহাকে আমাদিগের ভিতর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হইয়া থাকে। *

যে সকল দেবতা আমাদিগের ভাগ্যচক্র ঘূর্ণিত করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদেরও আমাদের ন্যায় কর্ম্ম আছে; যাঁহারা পৃথিবীর কর্ম্মের সহিত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায়—এবং আমরা তাঁহাদেরই উপাদান বা অংশ বলিয়া, আমাদের সহিত তাঁহারাও—পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং তাঁহারা আমাদের ন্যায় এই পৃথিবীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যখন সম্বন্ধের কথা উত্থিত হইয়া থাকে, তখন ক্ষুদ্র অথবা মহান্ বলিলে, কিছু আসিয়া যায় না।

উচ্চ হইতে দেখিতে গেলে বলা যায়, পৃথিবীর উপর যে সকল উদ্ভিদ্ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারা ধূলিকণার ন্যায় একই পদার্থ এবং যে সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব ঐ সকল ধূলিকণায় জীবন ধারণ করে, তাহারা অন্যান্য জীবের ন্যায় একই প্রকারের। একই ঈশ্বর—যিনি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার প্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনি—মনুষ্যকে ও এই ভুবনের সমগ্র

* ছান্দোগ্য উপনিষদে "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযতিরে" এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে জানা যায় যে, মনুষ্যের শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেবতা, এবং তামসিক প্রবৃত্তিই অসুর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জীবনকে চালিত করিতেছেন। আমাদের যেমন সময়ে সময়ে পীড়া ও দৈবদুর্ঘটনা হইয়া থাকে, সেইরূপ এই ভুবনেরও যে, সময়ে সময়ে পীড়া ও দৈব দুর্ঘটনা হইয়া থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কলিকাতা-নগরীর জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, যেমন নগরীর কোন ক্ষতি হয় না, সেই প্রকার আমাদের এই ক্ষুদ্র ভুবনের লোপ যদি কল্যই হয়, তাহা হইলে বিশ্বের যে কোন ক্ষতি হইবে, তাহা কেহ বলিতে সাহস করেন না। আমাদের পক্ষে এইটুকু অবগত হইলেই যথেষ্ট হইবে যে, জন্মান্তরগ্রহণের ও কর্ম্মের নিয়মের দ্বারা মনুষ্যজাতির উত্তরোত্তর বুদ্ধি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই নিয়ম দুইটীর দ্বারা আমরা অবশেষে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইব যে, মনুষ্য তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত এবং তাহার নিজের সহিত সমপ্রাণতা ধারণ করিবে। সুখের রাজত্ব—কবির কল্পনা নহে। আমরা যে মহতী নৈসর্গিক শক্তির মধ্যে রহিয়াছি, সেই শক্তিই আমাদের জন্য ঐরূপ অবস্থা আনয়ন করিবে। মনুষ্য যেমন সুখের স্বপ্নে ভীত হয় না, সেইরূপ আমরা তখন মৃত্যুতে ভীত হইব না; আমরা তখন মৃত্যুকে জয় করিব। আমরা প্রত্যেকে সেই সুখ উপভোগ করিব, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা সকলে যদি বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যের দ্বারা সেই সুখের রাজত্ব পাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা অদূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং আমাদের এই পৃথিবী, সৌন্দর্য্য ও সুখের আগার হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(ব্যক্তিগত কর্ম্ম)

আমরা পূর্ব্বে কর্ম্মের তিনটী বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা কেবল প্রথম মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অদৃষ্টবাদী বা দৈবের উপাসক। যাঁহারা কেবল দ্বিতীয় মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীবন্ত বস্তুর স্বতঃক্রিয়মাণা শক্তির উপর তাঁহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা হঠবাদী। তৃতীয় মতটী যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে অনুসরণ করেন, তাঁহারা প্রাক্তনশালী পুরুষ বলিয়া কথিত হন। এই

তিনটী উপকরণ ভিন্ন কর্ম্মের যে আর চতুর্থ উপকরণ নাই, তাহা শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সর্ব্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্ত্যতঃ।
পুংসঃ প্রযত্নজং কিঞ্চিত্রৈধমেতন্নিরুচ্যতে॥
ন চৈবৈতাবতা কার্য্যং মন্যন্ত ইতি চাপরে।
অস্তি সর্ব্বমদৃশ্যং তু দিষ্টঞ্চৈব তথা হঠঃ॥
দৃশ্যতে হি হঠাচ্চৈব দিষ্টাচ্চার্থস্য সন্ততিঃ।
কিঞ্চিদ্দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বভাবতঃ॥
পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কারণম্।
কুশলাঃ প্রতিজানন্তি যে বৈ তত্ত্ববিদো জনাঃ॥"

—(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩২; ১২ হইতে ১৫ শ্লোক।)

অর্থাৎ কেহ কেহ কহেন যে, সকল কর্ম্মই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কেহ বা বলেন যে, সকলই দৈবপ্রভাবে হয়; কেহ বা কহেন, মনুষ্যের প্রযত্নেই কর্ম্মসকল সিদ্ধ হয়। কিন্তু তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্য হঠ, দৈব এবং স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অদৃষ্টপর ও হঠবাদী এই উভয় প্রকার লোকই শঠ; যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি, জলমধ্যস্থ আমঘটের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়; ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কর্ম্মের তিনটী বিভিন্ন উপাদান লইয়া আলোচনা না করিলে কর্ম্মবাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না।

পূর্ব্বে কর্ম্মের দুইটী বিভিন্ন উপাদানসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় উপাদান বা ব্যক্তিগত কর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সাধারণতঃ লোকে কর্ম্মঅর্থে ব্যক্তিগত কর্ম্ম বুঝিয়া থাকেন, সেই জন্য কর্ম্মবাদসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে, তাঁহারা তাহাদের সবিশেষ মীমাংসা করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কোন বিষয় সংঘটিত হইতে পারে না, যাহা অতীত অথবা ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত নহে। দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেঽত্র ভবিষ্যতি"। (১—৫—৭৮)

অর্থাৎ এই সংসারে কারণ বিনা কেমন করিয়া কার্য্য হইতে পারে? সেইরূপ হয় না বলিয়া, অর্থাৎ কার্য্যকারণের শৃঙ্খল বা কর্ম্মের নিয়ম অচ্ছেদ্য বলিয়া শাস্ত্র-কারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি যেভ্যো ন প্রভবতি।"

পুনশ্চঃ—"ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্॥"
(মহাভারত, বনপর্ব্ব—৩২—২১)

অর্থাৎ সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট অবধারণ করিতে পারিতেছি যে, জীবাত্মা (Ego) একটী নিয়মের মধ্যে অবস্থিত। যে পর্য্যন্ত সেই জীবাত্মা কর্ম্মের বিভিন্ন উপকরণসমূহকে—যাহাদিগকে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভাব (influence) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদিগকে—বুঝিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত সে, অবস্থার দাস হইয়া পড়ে; কিন্তু যখন ঐ সকল উপকরণ-সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজের কার্য্যোপযোগী করিবে বলিয়া ঐ সকল শক্তিকে চালিত করিয়া থাকে। কর্ণহীন নৌকা যেমন স্রোতঃ ও বায়ুর দাস হইয়া পড়ে, উহাকে তখন যেমন ইচ্ছামত ব্যবহারে আনিতে পারা যায় না, সেইরূপ যাঁহারা কর্ম্মের নিয়ম অবগত নহেন, তাঁহারা কর্ম্মের দাস হইয়া পড়েন। কিন্তু দাঁড়, পাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ লইয়া যেমন নৌকাকে যদৃচ্ছা চালিত করা যায়—তখন আমরা যে, স্রোতের অথবা বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন করি, তাহা নহে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালিত হইতে থাকে। তবে স্রোতঃ ও বায়ুর প্রবাহের জ্ঞান থাকাতে একটী শক্তিকে অপর শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত করিয়া, আমরা নৌকাকে

যদৃচ্ছা পরিচালিত করিয়া থাকি, সেইরূপ কর্ম্মের নিয়মের অর্থাৎ নৈসর্গিক শক্তির জ্ঞান থাকিলে, আমরা আমাদের প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত (neutralize) করিতে পারি। সুতরাং, কর্ম্মের নিয়মসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কর্ম্মবাদ আলোচনা করিলে আমরা কর্ম্মের নিয়ম অবগত হইয়া থাকি; কর্ম্মের নিয়ম অবগত হইতে পারিলে, আমরা কর্ম্মের দাস হইব না।

কোন একটী নিয়মের সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে ঐ নিয়মের অধীন কার্য্য-সকলকে আমাদের স্বপক্ষে কিরূপে আনিতে পারি, তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতির এইরূপ একটী নিয়ম আছে যে—'সাধারণ চাপে জল ১০০° ডিগ্রিতে (সেন্টিগ্রেড্) ফুটিতে থাকে।' এই নিয়ম হইতে আমরা এমন কিছু অনুজ্ঞা পাইতেছি না যে, জলকে ফুটাইতেই হইবে; বরঞ্চ জলকে কেমন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় ফুটান যায়, তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে। আমরা অবগত আছি যে, পর্ব্বতোপরি অর্থাৎ যে স্থানে বায়ুর চাপ কম, সেখানে ১০০° ডিগ্রির নীচে জল ফুটিয়া থাকে এবং যেখানে বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে ১০০° ডিগ্রির উপরে জল ফুটিয়া থাকে। সুতরাং আমরা ঐ নিয়ম হইতে অবগত হইতেছি যে, কি কি অবস্থায় জলকে ফুটান যায়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নিয়মসমূহ এমন কতকগুলি অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যে সকল অবস্থায় কতকগুলি ফল ফলিয়া থাকে। যেরূপ ফল আকাঙ্ক্ষা করা যায়, সেই অনুসারে আমরা অবস্থাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি। ১০০° ডিগ্রির উত্তাপের নীচে জল ফুটাইতে হইলে পর্ব্বোতপরি অথবা যেখানে বায়ুর চাপ কম, সেইখানে যাইতে হইবে এবং ১০০° ডিগ্রির উত্তাপের উপরে জল ফুটাইতে হইলে যেখানে বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে যাইতে হইবে। সুতরাং নিয়মিত অবস্থাসমূহ হইতেই আকাঙ্ক্ষিত ফল ফলিয়া থাকে। কোন নিয়মই আমাদিগকে এমন অনুজ্ঞা করে না যে, কোন নির্দ্ধারিত কার্য্য করিতেই হইবে, বরং নিয়মটী জানিলে সকল প্রকার কার্য্য করাই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কর্ম্মবাদ আর কিছুই নহে—কেবল নৈতিক জগতে পার্থিব নিয়মমাত্র,—বিজ্ঞানের রাজত্ব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে।

কর্ম্মফল।

জীবাত্মা তিনপ্রকারশক্তিসম্পন্ন—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। পার্থিব জগতে ক্রিয়া দ্বারাই শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। যথাঃ—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

—(শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ, আত্মার পরা শক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা)-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটী স্বভাবসিদ্ধ। ক্রিয়া দ্বারা শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। আত্মারও এই তিন শক্তির প্রকাশ, ক্রিয়া দ্বারা হইয়া থাকে। যথা—জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া ভাবনা (Thought), ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বাসনা (Desire) এবং ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়া কৃতি বা চেষ্টা (Action)। এই যে ত্রিবিধ ক্রিয়া—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা—ইহাদিগের সাধারণ নাম কর্ম্মফল। কর্ম্মফল কর্ম্মের উত্তররূপ এবং কর্ম্ম কর্ম্মফলের পূর্ব্বরূপ। ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে; সুতরাং কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ফলিবেই। অতএব ভাবনা, বাসনা এবং চেষ্টার কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

শাস্ত্রে ব্যক্তিগত কর্ম্ম চারিপ্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—(১) কৃষ্ণঃ—নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ম্মের ফল কৃষ্ণ। (২) শুক্লকৃষ্ণঃ—অর্থাৎ যে কর্ম্মে পাপও আছে এবং পুণ্যও আছে—যেমন বহিঃসাধনসাধ্য যাগাদি কর্ম্ম। ইহাতে পরপীড়া আছে এবং পুণ্যও আছে। (৩) শুক্লঃ—তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ধ্যানসাধ্য কর্ম্ম; ইহাতে পরপীড়ার সংস্রব নাই। (৪) অশুক্লাকৃষ্ণঃ—যোগীদিগের যোগানুষ্ঠান। কারণ, তাহাতে পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহার ফল, ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

কর্ম্মের ফল দুই প্রকারে ফলিতে দেখা যায়—স্বগত ও পরগত ভাবে। কর্ম্ম করিলে কেবল যে, কর্ত্তারই স্বগত (Subjective) ফল হয়, তাহা নহে; তাহার পরগত (Objective) ফলও অপরিহার্য্য। কর্ম্মের স্বগত ফল দ্বিবিধ—সংস্কার ও অদৃষ্ট। মনুষ্য, পঞ্চকোষ বা আবরণবিশিষ্ট জীব। ইহা যে কোষের দ্বারা ক্রিয়া করুক না কেন, তাহার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—অন্নময় কোষ (Physical body); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র,—কামময় কোষ (Astral body) এবং জ্ঞানশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—মনোময় কোষ (Mental body).

সুতরাং ভাবনাতে মনোময় কোষের, বাসনাতে প্রাণময় কোষের এবং চেষ্টনাতে অন্নময় কোষের স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সেই স্পন্দনের ছাপ (Impression) বা সংস্কার সেই কোষে পড়িয়া যায়। শব্দ উৎপন্ন করিলে ফনোগ্রাফের নলে (Cylinder) যেমন দাগ পড়ে এবং সেই দাগ হইতে যেমন শব্দ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি যে কোষের কার্য্য করা হউক না কেন, সেই কোষে ঐ প্রকার ছাপ পড়ে; সেই ছাপকে সংস্কার বলে। ইহাই কার্য্যের স্বগত ফল।

ইহা ভিন্ন কর্ম্মের পরগত ফল আছে। যে ক্রিয়া দ্বারা পরকে নিয়মিত (affect) করা যায়, তাহার নাম পরগত ক্রিয়া এবং তাহার ফলের নাম পরগত ফল। কৃতি বা চেষ্টনা যে, পরকে নিয়মিত (affect) করে, অর্থাৎ অপরের ইষ্ট বা অনিষ্টকারী হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু ভাবনা বা বাসনা যে, অপরকে কি করিয়া নিয়মিত করে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। অনেকে আবার ইংরাজ কবি Milton (মিল্‌টনের) বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে,—"Evil in the minds of men may come and go and have no stain impressed."—অর্থাৎ মন্দ বিষয়, মনুষ্যের মনে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইতে পারে; কিন্তু উহারা মনুষ্যের মনে কোন কালিমা (সংস্কার) রাখিয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা যে, কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? মিল্‌টন্ যাহা বলেন, বলুন কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট কি বলিয়াছেন, দেখুন—"By thinking of adultery you have already committed adultery in you heart."—অর্থাৎ, মনে মনে পাপ কার্য্যের চিন্তা করিলে, কার্য্যতঃ মনোমধ্যে পাপ কার্য্য সমাধা করা হয়, ইহা অবগত হওয়া উচিত।

ভাবনা ও বাসনা দ্বারা পরকে কিরূপে নিয়মিত করা যায়, তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental psychology) আমাদিগকে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে, আজকাল বিজ্ঞানের বলে বিনা তারে সংবাদাদি দূরদেশে পাঠান যায়। ইহাকে তার-বিহীন (wire-less) টেলিগ্রাফ্ বলে। বিনা তারে যেমন সংবাদ প্রেরণ করা যায়, সেইরূপ

পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভাবনা অথবা বাসনা এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে সংযোগ ব্যতিরেকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাকে 'টেলিপ্যাথি' (Telepathy) বা চিন্তা-প্রেরণ বলে। টেলিগ্রাফে যেমন এক যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা যায়, এবং অন্য যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ চিন্তা-প্রেরণের সময় এক মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের দ্বারা চিন্তা প্রেরণ করা হয় এবং অন্য মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই চিন্তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে; আমাদের মস্তিষ্ক সময় সময় সেই সকল চিন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা যে সকল ভাবনা ও বাসনা করিয়া থাকি, তাহার পরগত (objective) ফল এই যে, সেই সকল ভাবনা ও বাসনাকে সময় সময় অপর ব্যক্তিসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং চেষ্টনার বিষয়ে যেমন আমাদের দায়িত্ব, বাসনা ও ভাবনার বিষয়েও সেইরূপ দায়িত্ব। যদি আমরা কুভাবনা বা কুবাসনা করি, তাহার যে, কেবল স্বগত (subjective) ফল হইবে, অর্থাৎ আমাদের ক্ষতি হইবে—তাহা নহে; তাহার পরগত (objective) ফলও হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অপরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ কিরূপে কার্য্যকারী হয়, এবং কেনই বা ধর্ম্মজ্ঞেরা শক্রর সম্বন্ধেও দ্বেষ-হিংসার ভাব বর্জ্জন করিয়া মৈত্রীর ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্র আমাদিগকে কুচিন্তা ও কুবাসনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ মনঃসংযমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং যাহারা বাহিরে ক্রিয়া সংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, তাহাদিগকে 'মিথ্যাচার' বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কেবল যে, সংস্কাররূপ স্বগত ফল হয়, তাহা নহে; ইহাদিগের পরগত ফলও হইয়া থাকে।

ইহা কর্ম্মের সাক্ষাৎ (Immediate) ফল। কর্ম্মের পরোক্ষ ফলও আছে, তাহাকে অদৃষ্ট বলে। আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমরা অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি। এক জন অপরকে হত্যা করিলে, অথবা তাহার প্রাণরক্ষা করিলে, তাহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির

সহিত তাহার একটী অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। প্রথম স্থলে হত ব্যক্তির নিকট সে ঋণী হইল; দ্বিতীয় স্থলে রক্ষিত ব্যক্তি তাহার নিকট ঋণী হইল। চিত্রগুপ্তের চিরন্তন খাতায় এই দেনা-পাওনার জমাখরচ রহিল। যত দিন না এই ঋণ ওয়াশীল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। হন্তাকে হত হইতে হইবেই; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইবেই। এই রূপেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। নিম্নে কর্ম্মফলের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

		স্বগত	পরগত
কর্ম্মফল—	সাক্ষাৎ	(১) সংস্কার,	(২) পরের ইষ্টানিষ্ট।
	পরোক্ষ	অদৃষ্ট।	

কর্ম্মবাদ আলোচনা করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে ইচ্ছা বা কামনা জন্মিয়া থাকে, তাহার পর ভাবনা এবং তৎপরে চেষ্টনা জন্মিয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি।
যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে॥"

(৪-৪-৫)

অর্থাৎ, মনুষ্য আর কিছুই নহে—কেবল কামময়। তাহার কামনা যেরূপ হয়, তাহার ভাবনা সেইরূপ হইয়া থাকে; তাহার ভাবনা যেরূপ হয়, তাহার চেষ্টনা বা কার্য্য সেইরূপ হইয়া থাকে এবং যেরূপ কার্য্য করে, তাহার ফলও সেইরূপ পাইয়া থাকে। সুতরাং কামনাই সংসারের মূল কারণ।

ব্যক্তিগত কর্ম্মের আলোচনা করিলে আমরা তিনটী নিয়ম পাইয়া থাকি। এই তিনটী নিয়ম একত্র মিলিত হইয়া ব্যক্তিগত কর্ম্মের ফল নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। এই সকল নিয়মের আলোচনার ফলে কার্য্যকারণের শৃঙ্খল অবগত হওয়া যায় এবং আমরা যেরূপ ফল পাইতে চেষ্টা করিব, সেই অনুসারে আমাদের অদৃষ্ট গঠিত হইবে এবং পরজন্ম নিয়মিত হইবে। নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম নিয়ম। যে স্থানে কামনার বিষয় থাকে, কামনা মনুষ্যকে সেই

স্থানে লইয়া যায়। মনুষ্য, ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তাহা এই নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪—৪—৬) উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"তদেব শক্তঃ সহকর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।"

অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়ের জন্য মনঃ নিষক্ত করে, কার্য্যদ্বারা মনুষ্য সেই বিষয় প্রাপ্ত হয়। যেমন, যাহারা স্বর্গকামনা করে, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কামনাই মনুষ্যকে কামনার বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। কামনার বিষয়ের অপর নাম 'ফল'। মনুষ্য যত ক্ষণ ফল অর্থাৎ কামনার বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, তত ক্ষণ তাহার বন্ধন থাকে। যখন ঐ ফল, সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে, তখন আমরা বলি যে, আমরা শুভ অথবা অশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি। মনুষ্য যখন পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবগত হয়, তখন সে তাহার কামনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে এবং যে ফল পাইলে তাহার সুখ হইবে, কেবলমাত্র সেই ফল সে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; এই কর্ম্মের ফল অপর জন্মে ফলিবেই। ইহাই প্রথম নিয়ম এবং এই প্রথম নিয়মটী কামনাস্বভাব বা বাসনা-সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় নিয়ম। মনঃ ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন; মনঃ যেরূপ চিন্তা বা ভাবনা করিবে, মনুষ্যও সেইরূপ হইবে। এই জন্য গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" —(ছান্দোগ্য, ৩—১৪—১)।

অর্থাৎ, মনুষ্য নিশ্চয় চিন্তাময়; মনুষ্য এই পৃথিবীতে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পর তাহাই হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা মনোরূপে আমাদিগের ভিতর প্রতিফলিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং মনঃও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেমন চিন্তা করিলেন, অমনই সেই চিন্তা বহির্মুখী হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল। চিন্তা যখন বহির্মুখী হয়, তখন কার্য্য-

রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং মনুষ্য যখন কার্য্য করে, তখন সে তাহার অতীতের চিন্তাকে বহির্মুখী করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। ব্রহ্মা যেমন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, আমাদের মনঃও সেইরূপ মূর্ত্তিমতী চিন্তা বা ভাবনা সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বভাব বা চরিত্র মনুষ্যের চিন্তাকৃত। মনুষ্য এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, সে তাহারই চিন্তাকৃত অবস্থা। মনুষ্য এখন যেরূপ চিন্তা করিতেছে, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইবে। সুতরাং মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারে। পবিত্র বিষয় চিন্তা করিয়া মনুষ্য পবিত্র হইবে এবং অপবিত্র বিষয় চিন্তা করিয়া মনুষ্য অপবিত্র হইবে। ব্যক্তিগত কর্ম্মের ইহাই দ্বিতীয় নিয়ম। এই নিয়মটী মনুষ্যের মনঃসংক্রান্ত। এই নিয়মের মর্ম্ম এই যে, ভাবনার দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় নিয়ম। চেষ্টনা বা কার্য্যের (Action) দ্বারা মনুষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী, করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণসংপ্রযুক্তঃ, শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি॥"
—(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—২০১—২৩)

অর্থাৎ কর্ম্মফলে নিবিষ্ট হইয়া ফলপ্রার্থী ব্যক্তি, যে প্রকার শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার শুভাশুভ ফল ঐ ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, শুভকার্য্যের জন্য শুভফল এবং অশুভ কার্য্যের জন্য অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—"নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিৎ, নাকৃত্বা সুখমেধতে।
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং, প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ॥"
—(ঐ—২৯১—১২)

অর্থাৎ, বীজ ভিন্ন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। যে কার্য্য করিলে সুখ পাওয়া যায়, সেই কার্য্য না করিলে, কোন ব্যক্তিই সুখ পায় না। যেমন বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফল ফলিবে। আমড়ার বীজ বপন করিলে যেমন আম্র ফলে না, সেইরূপ কুবীজে কখন সুফল পাওয়া যায় না।

সেই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,—"তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ" (যোগদর্শন, সাধনপাদ)—অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। ইহজন্মে মনুষ্য যদি তাহার চতুর্দ্দিকে সুখ বিস্তার করিতে থাকে, তাহা হইলে, পরজন্মে সে সুখভোগ করিবে। এই প্রকার কর্ম্মের নিয়ম অবগত হইয়া মনুষ্য যেমন তাহার সদসৎ চরিত্র গঠন করিতে পারে, সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্য সুখ অথবা দুঃখের অবস্থা প্রস্তুত করিতে পারে। কর্ম্ম-সম্বন্ধে ইহাই তৃতীয় নিয়ম।

এই তিনটী নিয়মের দ্বারাই ব্যক্তিগত কর্ম্মের ফলভোগ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা সর্ব্বদা নূতন কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছি, এবং অতীতে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি; আমরা অতীতে যেরূপ অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা অতীতে যেরূপ বিষয়ের কামনা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে সেইরূপ বিষয় পাইবার সুবিধা পাইয়াছি; তখন আমরা যেরূপ সামর্থ্য (Capabilities) সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়াছি; তখন যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখন সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর রহিয়াছি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, অতীতে যে জীবাত্মা ঐরূপ কামনা, বাসনা ও চেষ্টনা করিয়াছিলেন, এখনও সেই জীবাত্মাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং ইনি এখন যে সীমার ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছেন, সেই সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিলেও উহাকে পরিবর্ত্তিত করিবার ইঁহার সামর্থ্য আছে, এবং ভবিষ্যতের জন্য উত্তম অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন। এই জন্য ভীষ্ম, পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা বড় বলিয়াছিলেন। মনুও বলিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া॥"

—(মনুসংহিতা—৭—২০৫)

সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই দৈব এবং মনুষ্যাধীন বটে; কিন্তু দৈব, অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার গোচর নহে,—পৌরুষব্যাপার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য।

মনু আরও বলিয়াছেন যে কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারাই শুভ অথবা অশুভ কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে এবং সেই কার্য্যগতি অনুসারে জীবের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতিপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু মনঃই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পরের দ্রব্য অন্যায়রূপে কি প্রকারে আত্মসাৎ করিব সেই চিন্তা, মনের দ্বারা অনিষ্টচিন্তা এবং পরলোক নাই, দেহই আত্মা—এইরূপ বিচারকে অশুভ-দায়ক মানস কর্ম্ম বলে। পরুষবাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ-কথন, রাজার, স্বদেশের বা পুরাদি-সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বদ্ধ প্রলাপকে অশুভকর বাচিক কর্ম্ম বলে। অদত্তধনগ্রহণ, অবৈধ হিংসা এবং পরদার-সেবাকে শারীরিক অশুভ কর্ম্ম বলে। মনুষ্য, মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনঃ দ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্য দ্বারা এবং শরীরকৃত কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে। মনু ইহাও বলিয়াছেন যে, শারীরিক-কর্ম্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিককর্ম্মদোষের আধিক্যে পক্ষিযোনি বা পশুযোনি এবং মানসকর্ম্মদোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়। মনু এই ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। *

ব্যক্তিগত কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বর্ত্তমান। যে কর্ম্মের ফল, ভোগের নিমিত্ত পক্ব হইয়াছে এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে প্রারব্ধ বলে। ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতীতের পুঞ্জীকৃত কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। ইহার ফলে মনুষ্যের চরিত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের সৎ এবং অসৎ চরিত্রে, তাহার সামর্থ্যে ও তাহার দুর্ব্বলতায়, সঞ্চিত কর্ম্মের ফল কতক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে বর্ত্তমান কর্ম্ম বলে। এই ত্রিবিধ-কর্ম্মসম্বন্ধে দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্॥

* * * * *

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে॥

সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ৎ কিল।

* মনুসংহিতা—১২—৩ হইতে ৯ শ্লোক।

দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ।
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং * * *॥"

(দেবীভাগবত ৬—১৯—৯, ১২, ১৩, ১৪)

অর্থাৎ, অনেক জন্ম ধরিয়া যে প্রাক্তন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে বর্ত্তমান বলে। সঞ্চিতের মধ্য হইতে যে অংশ নির্ব্বাচিত হয় এবং দেহারম্ভের পূর্ব্বে কাল যাহা প্রেরণ করে, তাহাকে প্রারব্ধ বলে।

যে কর্ম্ম একস্থ ও পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। এই সঞ্চিত কর্ম্ম, মনুষ্যের পশ্চাতে রহিয়াছে। মনুষ্যের বৃত্তিসকল সঞ্চিত কর্ম্ম হইতেই আসিয়া থাকে। যাহা ক্রিয়মাণ এবং ভবিষ্যতের জন্য যাহার বীজ রোপিত হইতেছে, তাহাকে বর্ত্তমান বা আগামি কর্ম্ম বলে। যে কর্ম্মকে এই জন্মে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং যে কর্ম্মের ফল, বাস্তব পক্ষে ভোগ করা যাইতেছে, তাহাকে প্রারব্ধ বলে। সুতরাং আমরা এখন প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতেছি এবং বর্ত্তমানে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফল, ভবিষ্যতে ভোগ করিব। এই জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মকে আগামি কর্ম্ম বলে।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুঞ্জীকৃত সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্য হইতে প্রারব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হয়। হস্তনিক্ষিপ্ত শরের সহিত, শাস্ত্রে প্রারব্ধ কর্ম্মকে তুলনা করা হইয়াছে। একটী পার্থিব স্থূল শরীরধারণ করিয়া যতগুলি কার্য্য করা সম্ভবপর, কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃদেব † তদুপযুক্ত কর্ম্ম করিবার জন্য মনুষ্যের পার্থিব স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এবং তাহাকে সেই কর্ম্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পিতা, মাতা, দেশ, জাতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে স্থাপন করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত করা যায় না, তাহার ফল অনিবার্য্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"

(দেবীভাগবত—৬—২—৮।)

† হিন্দুরা ইঁহাকে কাল বা বিধাতা বলেন এবং বৌদ্ধরা "লিপিক" বলেন।

অর্থাৎ, ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ভিন্ন প্রারব্ধ কর্ম্মের অন্য প্রকারে ক্ষয়ের উপায় নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সৎ অথবা অসৎ হউক, স্থির ভাবে এবং সন্তোষের সহিত বহন করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমরা যে সকল ঋণ করিয়াছি, প্রারব্ধের ভোগের দ্বারা আমরা সেই ঋণ শোধ করিতেছি।

সঞ্চিত কর্ম্মকে আমরা অনেক পরিমাণে পরিণমিত করিতে পারি। মন্দ স্বভাবকে অনেক পরিমাণে ভাল করিতে পারা যায়; সৎ স্বভাবকে পুষ্ট করিতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কামনা এবং প্রত্যেক চেষ্টনার দ্বারা ভবিষ্য জন্মে যাহা আমাদের সঞ্চিত কার্য্য হইবে, আমরা তাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় করিতে পারি।

একই জীবনে বর্ত্তমান কর্ম্মের ফল অনেক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি অনিষ্টের দ্বারা পরের মন্দ করিয়াছে, সে ঐ মন্দ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিলে এবং যে ঋণশোধের সময় হয় নাই, সেই ঋণ ভবিষ্যৎ কালে শোধ না করিয়া, শোধের সময়ের পূর্ব্বে শোধ করিলে, বর্ত্তমান কর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" অর্থাৎ কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও ভোগ ভিন্ন কর্ম্মের ক্ষয় নাই। দুঃখভোগের দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্মের এবং সুখভোগের দ্বারা সুকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগান্ন তৎক্ষয়ঃ॥"

—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্ম, উত্তরচরিত, ৮৪)

সেই জন্য মহাভারতকার বলিয়াছেন যে,—

"যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥"

—(শান্তিপর্ব্ব—১৮১—১৬)

অর্থাৎ, যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস আপন মাতাকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ

পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, কর্ত্তাকে অনুসরণ করে। অতএব কর্ম্মের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, ভোগ কবে হয়? কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ পরজন্মে ভোগ হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন যে, "ফলতি গৌরিব"। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"পুত্রেষু বা নপ্তৃষু বা ন চেদাত্মনি পশ্যতি।
ফলত্যেব ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে॥"

—(আদিপর্ব্ব—৮০—৩)।

অর্থাৎ গুরুভোজন করিলে যেমন তাহার ফল ভোগ করিতেই হয়, তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে, তাহার ফল যদি আপনাতে নাও দেখা যায়, কিন্তু পুত্রে বা পৌত্রে তাহার ফল ফলিবেই। কিন্তু, শাস্ত্রে আবার এইরূপও উল্লিখিত আছে যে,—

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥"

—(মনুসংহিতা—৪—২৪০)।

অর্থাৎ জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লয়প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপন সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করে।

মনুষ্য, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যত কর্ম্ম করিতেছে, তাহা সমুদয় একত্র হইয়া মনুষ্যের সহিত রহিয়াছে। ঐ একত্র কর্ম্মকে কর্ম্মাশয় বলে। উক্ত কর্ম্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই উহার ভোগ হয় এবং অপর কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্মান্তরে ফলোৎপাদন করে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভির্নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ"

অর্থাৎ, তীব্র সংবেগ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রযত্নবিশেষ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত অথবা পরমেশ্বর, দেবতা মহর্ষি ও মহাত্মগণের

আরাধনা দ্বারা নিষ্পন্ন পুণ্যকর্ম্মাশয় সদ্যঃ অর্থাৎ, সেই জন্মেই ফল উৎপন্ন করে। এবং—

"তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্যঃ এব পরিপচ্যতে।"

তাৎপর্য্য।—তীব্রক্লেশ অর্থাৎ উৎকট অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ দ্বারা সম্পাদিত, ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত অথবা মহানুভব তপস্বিগণের প্রতি বারংবার অপকারসম্ভূত পাপকর্ম্মাশয়, সদ্যঃই ফল উৎপন্ন করে। উৎকট পুণ্য অথবা পাপ কর্ম্মের ফল ইহজন্মেই ফলিয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

—(হিতোপদেশ)

অর্থাৎ, অত্যুৎকট পাপ ও পুণ্যের ফল ইহলোকেই তিন দিনে, তিন পক্ষে, তিন মাসে, কিংবা তিন বৎসরে ভোগ করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ নহুষ, নন্দীশ্বর, দশরথ, ধ্রুব ও সাবিত্রীর উৎকট কর্ম্মের ফল বক্তব্য। উঁহাদিগের উৎকট কর্ম্মের ফল ইহলোকেই ফলিয়াছিল। শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, নারক অর্থাৎ যাহাদের পাপভোগ নরকে হইবে, তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই, এবং ক্ষীণক্লেশ যোগিগণের অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই, অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কর্ম্মই ইহ-জন্মে শেষ হয়। সুতরাং—কর্ম্মের ফল কবে ফলিয়া থাকে? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সাধারণ কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে ফলে এবং অত্যুৎকট কর্ম্মের ফল ইহজন্মে ফলে। অত্যুৎকট কর্ম্ম কিরূপ, তাহা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিলাম যে, সঞ্চিতের ফলে আমরা চরিত্র পাইয়া থাকি এবং প্রারব্ধের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment) পাইয়া থাকি। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পতঞ্জলি "জাত্যায়ুর্ভোগ," বলিয়াছেন।

জাতি অর্থে মনুষ্যপ্রভৃতি জন্ম, আয়ুঃ অর্থে জীবনকাল এবং ভোগ অর্থে সুখদুঃখের সাক্ষাৎকারকে বুঝাইয়া থাকে।

কর্ম্মফলসম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে সাধারণতঃ দুইটী প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থিত হইয়া থাকে। (১) একটী কর্ম্ম, কি একটী জন্মের কারণ, অথবা বহুজন্মের কারণ? (২) অনেক কর্ম্ম, অনেক জন্মের কারণ, না একটী জন্মের কারণ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ, এইরূপ বলা যায় না। কারণ, অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান জন্মে যাহা কিছু করা হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের ফলোৎপত্তির পৌর্ব্বাপৌর্য্যের নিয়ম না থাকায় লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে; কিন্তু সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। একটী কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে যদি একটীই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির ভোগের অবসর ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না; সুতরাং ক্রমশঃ হয়, বলিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কর্ম্মসকল মরণসময়ে প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিতি করে। জন্মসময়ে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়। সেই সকল কর্ম্মকেই প্রধানভাবে অবস্থিত বলা যায় যাহারা সজাতীয় বলিয়া প্রারব্ধের সহিত মিলিত হইয়া জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ উৎপন্ন করে। অপ্রধান কর্ম্মসকল সঞ্চিতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন অনেক কর্ম্মের দ্বারা জন্ম উৎপন্ন হয়, তেমনই একজন্মে অনেক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং আয়ুর্ব্বায় একরূপ তুল্য হইয়া যায়। যে কর্ম্মসমষ্টির দ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও সুখদুঃখের ভোগ হইয়া থাকে।

কিন্তু এখানে এই আপত্তি হইতে পারে যে—যদি জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ একই কর্ম্মের ফল হয়, তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং কুকর্ম্ম দ্বারা আয়ুঃক্ষয় হয় কিরূপে? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রাচ্যদের

শরীরতত্ত্ব-বিজ্ঞান স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচ্যেরা জীবের আয়ুষ্কাল-পরিমাণ-সংখ্যক দিন, মাস, বৎসর দ্বারা গণনা করিতেন না। তাঁহারা আয়ুঃ অর্থে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাস বুঝিতেন। প্রাণায়াম করিলে ধীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে; সুতরাং সময় বর্দ্ধিত হয় এবং পাপ কর্ম্মে শীঘ্র শীঘ্র শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে, সেই জন্য সময় অল্প হইয়া আইসে। সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সেই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠিজাগরবাসরে।
ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নান্যথৈব কদাচন॥"

তাৎপর্য্য।—'ললাটে লিখিত' অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ব্যতিক্রম হয় না। সেই জন্য দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" (৪।২।৮)

মনু বলিয়াছেন যে,—

"যথার্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥"

—(মনুসংহিতা—১—৩০)।

অর্থাৎ ঋতুসমাগমে ঋতুচিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তনকর্ম্মফলসকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহধারিগণসম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই কার্য্যকারণের শৃঙ্খল আলোচনা করিতে গেলে, আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কিছু উপায় আছে কি না?

মনুষ্য, যত দিন এই বিশ্বে থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত মনুর অর্থাৎ বিশ্বের সাধারণ কর্ম্ম হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্, খনিজ প্রভৃতি সকলেই, কর্ম্মের নিয়মের অধীন। প্রকাশমান কোন জীবনই এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি পায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

"ব্রহ্মাদীনাং চ সর্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ।"

—(দেবীভাগবত—৪—২—৮)।

অর্থাৎ, হে নরাধিপ! ব্রহ্মাদি সকলেই কর্ম্মের নিয়মের অন্তর্গত। সুতরাং এই বিশ্বের বাহিরে না যাইলে, অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন না হইলে, কর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয়ের দ্বারা এবং নূতন কর্ম্মসৃষ্টি না করিয়া—মনুষ্য, জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে এবং ঈশ্বর যত কাল নিজেকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তত দিন মনুষ্য, ব্রহ্মে লীন না হইয়াও, পৃথক্ সত্তারূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। মনুষ্য দুই প্রকারে সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় এবং নূতন কর্ম্মের সৃষ্টিকে বাধা দিতে পারেন। প্রথম উপায়, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মকে দগ্ধ করা যায়—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইত্যাদি, (গীতা—৪—১৯); এবং দ্বিতীয় উপায়, যোগের দ্বারা কায়ব্যূহরচনা করিয়া, সঞ্চিত কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ না করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা যায়।

তত্ত্বজ্ঞান হইলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত কর্ম্মের বীজভাব নষ্ট করে। কর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইলে, কর্ম্ম, বিদ্যমান থাকিলেও, ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিথ্যা জ্ঞান কর্ম্মফলের সহকারি কারণ। যাঁহার আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মরূপ কারণ থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানরূপ সহকারি কারণ নাই বলিয়া কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইবে না। সেই জন্য চন্দ্রশেখর বাচস্পতি বলিয়াছেন যে,—

"মিথ্যাজ্ঞানসলিলাবসিক্তায়ামেবাত্মভূমৌ কর্ম্মবীজং ফলাঙ্কুরমারভতে ন তু তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামূষরায়ামপি" ইত্যাদি।

এস্থলে আত্মাকে ভূমি, কর্ম্মকে বীজ, ফলকে অঙ্কুর, মিথ্যাজ্ঞানকে সলিল এবং তত্ত্বজ্ঞানকে নিদাঘ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মিথ্যাজ্ঞানরূপ সলিলের দ্বারা ভূমি সিক্ত হইলে, কর্ম্মরূপ বীজের ফলরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তাপের দ্বারা ঐ ভূমি উষর (মরুভূমি) হয়, উহাতে অঙ্কুরোৎপত্তি অসম্ভব।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে কর্ম্মের ফল-ভোগের জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিয়া, তাহার

প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুম্ভকার, দণ্ড দ্বারা তাহার চক্র ঘূর্ণিত করিয়া উহা হইতে দণ্ড অপসারিত করিলেও যেমন চক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিতকর্ম্মফলোৎপাদনে অসমর্থ হইলেও, যে কর্ম্মফল জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে—অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম—তাহার ফলভোগানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছু কাল অবস্থিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহত্যাগ হইলে, তাহার আর দেহান্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না।

সুতরাং, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। এই জন্য জীবন্মুক্ত পুরুষগণ প্রারব্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। তাঁহারা প্রারব্ধকর্ম্মলব্ধ শরীরের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করেন। পুনশ্চ, অনারব্ধ কর্ম্মাশয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয়। উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। অতএব, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম"—এই বচন প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে এবং "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন"—এই বচন অনারব্ধ কর্ম্মাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে।

মনুষ্য এই প্রকারে কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং তখন হয় ঋষিদিগের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশের সাহায্য করেন, না হয় অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার জন্য ব্রহ্মে লীন হন। যতদিন পর্য্যন্ত না কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম-ফলের মহান্ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে হইবে—"জন্তু কর্ম্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর, যদি অন্যের কর্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও কর্ম্মকর্ত্তাকেই ভজনা করেন। কারণ, যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না। জীব, কর্ম্মবশে উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশেই শত্রু, মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়; সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকারী জীব, কর্ম্মেরই পূজা করিবে।"

—(শ্রীমদ্ভাগবত—১০—২৪—১৩ হইতে ১৭ শ্লোক।)

—০:)*(:০—

চতুর্থ প্রস্তাব।

(কর্ম্ম ও কৃত্যা।)

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের উপাখ্যানে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটী দেখিতে পাই। দৈত্যগণ যখন কোনপ্রকারে প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন দৈত্য-পুরোহিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য 'কৃত্যা' সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা,—

"ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ।
কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুর্জ্জ্বালামালোজ্জ্বলাকৃতিম্॥" (১—১৮—৩০)

অর্থাৎ দৈত্যরাজপুরোহিতেরা জ্বালামালায় উজ্জ্বলাকৃতি কৃত্যা উৎপাদন করিলেন।

"অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ॥" (১—১৮—৩৪)

পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়, উহা তাঁহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

তৎপরে প্রহ্লাদ উহাদিগের ঐরূপ গতি হইল দেখিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে,—

"তেষ্বহং মিত্রভাবেণ সমঃ পাপেঽস্মিন্ ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ॥" (১—১৮—৪০)

যাহারা আমার অনিষ্টচিন্তা করিয়াছে, সেই সকলেরই প্রতি আমি মিত্র-ভাবাপন্ন, আমি কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন। এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর উহারা জীবিত হইয়া উঠিল।

আমরা এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, প্রহ্লাদ অপাপবিদ্ধ বলিয়া কৃত্যা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরঞ্চ সে স্বীয় সৃষ্টি-কর্ত্তাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, তাহাদেরই অনিষ্ট করিল। তৎপরে প্রহ্লাদ প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে সেই অনিষ্টের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

'কৃত্যাকে'* শাস্ত্রে যজ্ঞদেবতাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে কার্য্যসম্পাদনের জন্য ইহাকে সৃষ্টি করা যায়, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ইহা লয়প্রাপ্ত হয়। মহাভারতাদি গ্রন্থে "কৃত্যার" বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বনপর্ব্বান্তর্গত ১৩৮ অধ্যায় যবক্রীতোপাখ্যানে (১৩শ শ্লোকে) এই কৃত্যার বিশেষ উল্লেখ আছে।

পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদেরা 'কৃত্যাকে' চিন্তাকৃতি (Thought form) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, চিন্তা করিলেই সেই চিন্তা একটী আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তার প্রাথর্য্য হইলে, এই আকৃতি অধিক-কালস্থায়িনী হয় এবং অল্প চিন্তায় এই আকৃতি অল্পকালস্থায়িনী হয়। তাঁহারা বলেন যে, একটী ভাবনা বা চিন্তা একটী বস্তুবিশেষ। এক একটী বস্তুর যেমন বিশিষ্ট বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি আছে, এক একটী চিন্তারও সেইরূপ এক একটী বিশিষ্ট বর্ণ, আকার প্রভৃতি আছে। চিন্তার আকৃতি অতি সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তি-গণ এই সকল আকৃতি দেখিতে পান না। যজ্ঞাদির দ্বারা চিন্তাশক্তির এত দূর প্রাথর্য্য হয় যে, চিন্তাকৃতি স্থূলীভূত হইয়া স্থূল আকার ধারণ করিয়া থাকে। তখন উহাকে সাধারণ লোকেও দেখিতে পায়।

পাশ্চাত্যেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চিন্তা-সকল পদার্থ-মাত্র। তাঁহারা যোগমুগ্ধ (hypnotic) অবস্থায় এই সকল পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সাদা কাগজের উপর কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে আমাদের মনের ভাব প্রতিফলিত হইয়া ঐ কাগজের উপর চিন্তাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। তখন এক জন যোগমুগ্ধ (hypnotised) ব্যক্তি এই চিন্তাকৃতি দেখিতে পাইবেন। চিন্তার প্রাথর্য্যে উহা এইরূপ স্থূলীভূত হইবে যে, ঐ ব্যক্তি সেই চিন্তাকৃতিকে হস্তে করিয়া তুলিতে পারিবেন।

চিন্তাকৃতিসকল কিরূপ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইতে হইলে, মনুষ্যের শারীরিক আবরণ কি পদার্থে প্রস্তুত, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য পঞ্চকোষ অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার শারীরিক আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। আমাদের দৃশ্যমান

স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলে। স্থূল শরীর আর একটী সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত; তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। ইহারা আবার আর একটী সূক্ষ্ম কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাহাকে মনোময় কোষ বলে, ইত্যাদি। আমরা মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকি এবং আমাদের মনঃ মনোময় কোষে অবস্থিত রহিয়াছে। মনোময় কোষ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। মনোময় কোষের দ্বারা মনের কার্য্য, চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। মনোময় কোষ, বিশ্বের যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, চিন্তাকৃতিগুলিও সেই সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। প্রশান্ত জলাশয়ে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করিলে, যেমন জল স্পন্দিত হয়, এবং তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সেইরূপ মনোময় কোষরূপ মনোময় ভূমিতে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে, ঐ শক্তি দ্বারা মনোময় কোষ স্পন্দিত হয় এবং তাহার ফলে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। ঐ তরঙ্গগুলি এক একটী আকৃতি ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। প্রস্তরখণ্ডে যে শক্তিপ্রয়োগ করা যায়, সেই শক্তির উপর যেমন তরঙ্গপরিচালন নির্ভর করিয়া থাকে, সেইরূপ চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্যের উপর চিন্তাকৃতির কার্য্যকারিতাশক্তি নির্ভর করে। সেই জন্য যে বিষয় চিন্তা করা যায়, মনঃ ঠিক্ সেই বিষয়ের যথাযথ আকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই এক এক প্রকারের লোকে মনুষ্য, এক একটী শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে। যথাঃ—

শরীর	কোষ	লোক
স্থূল	অন্নময়	ভূঃ
সূক্ষ্ম	প্রাণময়	ভূঃ
	মনোময়	ভুবঃ
		স্বঃ
	বিজ্ঞানময়	মহঃ
কারণ	আনন্দময়	জন, তপঃ ও সত্য।

মনুষ্য, অন্নময় ও প্রাণময় কোষে ভুবর্লোকে এবং মনোময় কোষে ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। "এই তিন কোষের উপর উন্নত জীবের আর তিনটী সূক্ষ্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষ। এই কোষত্রয়, আত্মার উচ্চতর ও অন্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র। সেই শক্তিত্রয়ের নাম সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সদ্‌ভাবের বিকাশ, সন্ধিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ—হিরণ্ময় কোষে। আত্মার আনন্দভাবের বিকাশ, হ্লাদিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ—আনন্দময় কোষে। আত্মার চিদ্‌ভাবের বিকাশ, সংবিৎ শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ—বিজ্ঞানময় কোষে। এই তিন সূক্ষ্মতর কোষেও শক্তির ক্রিয়ার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ঐ ক্রিয়ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবের আত্মার সচ্চিদানন্দ ভাব সম্পূর্ণ অব্যক্ত। সুতরাং, ঐ সূক্ষ্মতর কোষত্রয়ও অস্পষ্ট। অতএব কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সাধারণ আলোচনায় ইহাদিগের প্রসঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।" *

মনোময় কোষের দুইটী অংশ আছে। যথা, ভাবনাময় কোষ (thought body) এবং বাসনাময় কোষ (desire body)। মনুষ্য, প্রথমে একটী চিন্তা করে; ইহা প্রথমে স্বর্লোকে ভাবনাময় কোষের পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়। তৎপরে ইহা ভুবর্লোকে বাসনাময় কোষের অপেক্ষাকৃত স্থূল পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়। সূক্ষ্মদর্শীরা (Clairvoyants) এই আবৃত পদার্থকে দেখিতে পান। ইহা তখন স্থূল পার্থিব পদার্থ দ্বারা আবৃত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে এবং সুবিধা ঘটিলে, ইহাকে ভূর্লোকেও আনা যায়।

যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্র অলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের দ্বারা হাইড্রোজিন্ ও অক্সিজেন্ নামক বাস্পদ্বয়ের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুই ভাগ হাইড্রোজিন্ এবং এক ভাগ অক্সিজেন্‌কে একটী কাচের নলের ভিতর রাখিয়া উহার মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিলে, প্রথমে উহাকে বাস্পের ন্যায় দেখায়। পরে যত শীতল হয়, তত জলাকারে এবং অবশেষে কঠিন বরফের আকারে পরিণত হইয়া থাকে। চিন্তাসম্বন্ধে ঠিক্ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রথমে

---

* পন্থা—১৩১১—৫ ও ৬ সংখ্যা।

চিন্তার স্ফুলিঙ্গ, মনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে মানসিক পদার্থ দ্বারা চিন্তাকৃতি সৃষ্ট হয় (ইহা বাষ্পের সহিত তুলনীয়)। পরে এই চিন্তাকৃতি, ভুবর্লৌকিক পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় (জলের সহিত তুলনীয়); এবং অবশেষে ইহা পার্থিব পদার্থের দ্বারা আবৃত হয় (বরফের সহিত তুলনীয়)। মনুসংহিতায় আছে,—

"যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্যৎ কর্ম্ম নিষেবতে।
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে॥"

—(মনুসংহিতা, ১২—৮১)

অর্থাৎ, যে প্রকার ভাবের দ্বারা যে প্রকার কার্য্য করা যায়, সেই প্রকার শরীরের দ্বারা সেই কার্য্যের ফল ভোগ করা যায়। অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল মনোময় কোষের (mental body) দ্বারা ভোগ করা যায়। বাসনা দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল বাসনাময় কোষের (desire body) দ্বারা এবং চেষ্টার দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল স্থূল শরীরের দ্বারা ভোগ করা যায়।

এই সকল কৃত্যা বা চিন্তাকৃতি কতক্ষণ স্থায়িনী হয়? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দুইটী বিষয়ের উপর ইহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ মনুষ্য, যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ যেরূপ প্রাথর্য্যের সহিত চিন্তা করে, তাহার উপর ইহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের সৃষ্টির পর ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কিংবা অপরে বারংবার একই প্রকারে ঐরূপ চিন্তা করিলে, ইহারা পুষ্ট হয় এবং অধিককালস্থায়িনী হয়। আরও একটী কারণে ইহারা পুষ্ট হয়। কৃত্যাসকল একই প্রকারের হইলে, উহারা পরস্পরকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং সকলে মিলিত হইয়া আপনাদের শক্তি ও প্রাথর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া অধিক দিন ভুবর্লোকে কার্য্য করিয়া থাকে।

চিন্তাকৃতি বা কৃত্যাসকল আপনাদের স্রষ্টার সহিত একই সূত্রে গ্রথিত থাকে। তাহারা নিজেদের স্রষ্টার উপর কার্য্য করিয়া সংস্কার উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই সংস্কারের বলে মনুষ্য, বারংবার একই প্রকারের চিন্তা করে। ইহার ফলে মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি

উচ্চ ধরণের চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র উচ্চ ধরণের হয় এবং যদি নীচ ধরণে চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র নীচ হইয়া যায়।

প্রহ্লাদের উপাখ্যান ইহাতে আমরা তিনটী বিষয় অবগত হইলাম :— (১) কৃত্যাসকলকে অপর ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়। কৃত্যার গুণানুসারে অপর ব্যক্তিকে সাহায্যপ্রদান কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারা যায়। (২) মন্দ কৃত্যাকে শুভ চিন্তার দ্বারা নষ্ট করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মন্দ চিন্তা শুভ চিন্তার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৩) সদ্‌ব্যক্তির প্রতি অসৎকৃত্যা প্রয়োগ করিলে, উহা উৎপাদয়িতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহারই অনিষ্ট করে। ইষ্টচিন্তা, প্রার্থনা, ভালবাসা ও স্নেহের চিন্তাসকল অপর ব্যক্তিকেও যে, সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা কবি-কল্পনা নহে।

মনুষ্য যে, কেবল কৃত্যাসকল সৃষ্টি করিতে পারে, কিংবা অপরের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা নহে; তাহার কৃত্যাসকল যে প্রকার হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার অপরের কৃত্যাসকল আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই প্রকারে সেই ব্যক্তি বাহির হইতে অনেক পরিমাণে শুভাশুভ শক্তি পাইয়া থাকে; সুতরাং, শুভ অথবা অশুভ শক্তি আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা, তাহার নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি মনুষ্যের চিন্তাসকল পবিত্র ধরণের হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, উপকারি-সত্ত্বাসকল আকৃষ্ট করিবে এবং সে ব্যক্তি তাহার সাধ্যাতীত সৎকার্য্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইবে। সেই প্রকার যে ব্যক্তি, অসৎ চিন্তা করিয়া থাকে, সে অশুভ সত্ত্বাসকল আকৃষ্ট করিবে এবং তাহার সাধ্যাতীত মন্দ কার্য্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইবে ও বলিবে যে, আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল, তাই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। বাস্তবিক সে তখন অশুভ কৃত্যা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মনুষ্য শুভ চিন্তা দ্বারা শুভ কৃত্যা এবং অশুভ চিন্তা দ্বারা অশুভ কৃত্যা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য যত পবিত্র হয়, ততই অপবিত্র কৃত্যাসকলকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া থাকে।

মনুষ্য এই প্রকারে ব্যক্তিগত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সে, সমষ্টিগত কর্ম্মেরও ফল ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে

যে, একই প্রকারের কৃত্যাসকল, পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে বংশগত বা জাতিগত গুণসকল লব্ধ হয়। এই সকল কৃত্যা, ভুবর্লোকে এমন একপ্রকার অবস্থা আনয়ন করে যে, ইহার দ্বারা ঐ বংশীয় বা জাতীয় ব্যক্তিগণের কামনাময় শরীর নিয়মিত (affected) হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা ঐ সকল ব্যক্তকে নিয়মিত করে এবং মনুষ্য তাহার ফলে বংশগত অথবা জাতিগত গুণসকল লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চম প্রস্তাব।

(কর্ম্মরহস্য)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—মনুষ্যগণ, যে তিন লোকে বাস করেন, সেই তিন লোকের উপযোগিনী তিন প্রকার শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন,—(১) স্বর্লোকে মানসিক শক্তি, যাহার দ্বারা চিন্তারূপ কারণ উৎপন্ন হয়; (২) ভুবর্লোকে কামনারূপ শক্তি, যাহার দ্বারা কামনারূপ কারণ উৎপন্ন হয়; এবং (৩) ভূর্লোকে, এই সকল হইতে উৎপন্ন পার্থিব শক্তি, যাহার দ্বারা চেষ্টনারূপ কারণ উৎপন্ন হয়। উক্ত ত্রিবিধ শক্তির যে ত্রিবিধ ক্রিয়া হয়, তাহাদের সাধারণ নাম হইতেছে কর্ম্মফল। সুতরাং কর্ম্মের প্রধান কারণ হইতেছে—ভাবনা বা চিন্তা। ইহার ফলে চিন্তাকৃতি বা কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উপর মনুষ্যের ব্যক্তিগত কর্ম্ম নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং চিন্তাকৃতি না হইলে ব্যক্তিগত কর্ম্মের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই এবং মনোময় কোষ না থাকিলে, চিন্তাকৃতি হওয়া অসম্ভব। খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং কতক পরিমাণে জান্তব রাজত্বে মনোময় কোষ না থাকাতে ব্যক্তিগত কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না।

চিন্তা দ্বারা স্বর্লোকে কম্পন উৎপন্ন হয়। সেই কম্পনের ফলে চিন্তাকৃতি (thought form) উৎপন্ন হয়। পরে সেই কম্পন ভুবর্লোকে যায় এবং তাহার ফলে ঐ লোকের পদার্থসকল কম্পিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত চিন্তাকৃতি

ভুবর্লৌকিক স্থূল আবরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে তখন ভুবর্লৌকিক চিন্তাকৃতি (Astro-mental image) বলা যায়। অবশেষে ইহা পার্থিব লোকে আসিয়া থাকে। চিন্তার কম্পন যে, কেবলমাত্র নিম্ন দিকে পার্থিব লোকে আসিয়া থাকে, তাহা নহে। উহা উচ্চ আধ্যাত্মিক লোকেও গিয়া থাকে। তখন ঐ চিন্তাকৃতি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকার ধারণ করে এবং অবশেষে ব্যোমে অর্থাৎ আকাশতত্ত্বে গিয়া মিশিয়া যায়। এই আকাশে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর ছাপ পড়িয়াছে। ইহাকে চিত্রগুপ্তের খাতা বলে। মনুষ্য যাহা করে, তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের ছাপ, এই আকাশে অঙ্কিত হইতেছে। তত্ত্বদর্শি ঋষিগণ এই ছাপ দেখিতে পান। ম্যাজিক্ লণ্ঠনের চিত্রসকল যেমন বহির্দিকে প্রতিফলিত করা যায়, সেই রূপ এই সকল আকাশের চিত্রকে তত্ত্বদর্শি ব্যক্তিগণ ভুবর্লোকে প্রতিফলন করিয়া মানবের কর্ম্ম-বৈচিত্র্য অবগত হইয়া থাকেন।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, চিন্তা অথবা বাসনা দ্বারা চেষ্টনা উদ্ভূত হইয়া থাকে। চিন্তা অথবা বাসনা চারিটী উপায়ে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। যথা—(১) অনুভূতি (sensation) দ্বারা অন্তর হইতে উদিত হয়; (২) অপরের মনঃ হইতে উদ্‌ভূত চিন্তাশক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয়; (৩) অতীতে অনুভূত কোন বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা অন্তর হইতে উদিত হয়; অথবা (৪) উন্নত ব্যক্তিদের অন্তরাত্মা হইতে চিন্তাস্রোতঃ নির্গত হইয়া আসে। অনুন্নত ব্যক্তিদের বাসনা হইবামাত্র তাহারা একেবারেই চেষ্টনা করিয়া থাকে; তাহারা এ বিষয়ে কোন বিচার করে না; চেষ্টনার ফল হাতে হাতেই ফলিয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকারে ইহার ন্যায় অথবা অন্যায়ের জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু, ঐ চেষ্টনার ফল এইখানেই শেষ হয় না। কার্য্য দ্বারা যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার ফল জন্মিয়া থাকে। ভাবনারূপ কর্ম্মের ফলে কি প্রকারে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা সবিশেষ নিম্নে আলোচিত হইল।

মনুষ্য ইহ জীবনে অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া থাকে। এই চিন্তার ফলে দুইটী কার্য্য হইতেছে। প্রথমতঃ, মানসিক ছবিসকল (mental images) তাহার মনে চিত্রিত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল চিন্তা

উপাধি গ্রহণ করিয়া চিন্তাকৃতি (thought form)-রূপে বাহির হইতেছে। এই সকল চিন্তাকৃতি ভুবর্লৌকিক উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন ইহারা পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই সকল চিন্তাকৃতি অল্প অথবা অধিক দিন পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে; তৎপরে ইহাদের নাশ হয়। কিন্তু, মানসিক ছবিসকলের (Mental images) নাশ হয় না। তাহারা মনুষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। মনুষ্য, মৃত্যুর পর ঐ সকল ছবির সহিত ভুবর্লোকে যায়। ভুবর্লোক দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। যাহাদের প্রবৃত্তিসকল পাশবিক ও নীচ ধরণের, তাহারা প্রেতলোকে গিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির চর্চ্চা করে এবং পরজন্মে স্থূল শরীর ধরিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির চর্চ্চা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতার চিন্তা করিয়াছে এবং সেই রূপ মানসিক ছবিসকল গঠন করিয়াছে, প্রেতলোকে সে যে, কেবলই ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা-কারী পার্থিব দৃশ্যে আকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সে তাহার মনে মনে ঐ সকল কার্য্যের অভিনয় করিবে এবং ভবিষ্যতে ঐ প্রকার পাপ কার্য্যসকল করিবার জন্য প্রবৃত্তির বেগ বর্দ্ধিত করিবে। প্রেত-লোক হইতে মনুষ্য যখন পিতৃলোকে যায়, তখন উক্ত মানসিক ছবিসকল যে পদার্থে নির্ম্মিত, সেই পদার্থসকল খসিয়া যায় এবং ঐ ছবিসকল গূঢ়ভাবে মনুষ্যের মনে অবস্থান করে। তখন উহাদের সত্তা থাকে মাত্র; কিন্তু, পৃথক্ আকারে উহাদের অস্তিত্ব থাকে না। তখন উহারা বীজভাবে থাকে মাত্র। জীব যখন জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তখন গূঢ়ভাবে অবস্থিত চিত্রসকলকে বাহিরে প্রতিফলিত করে এবং তাহাদের প্রকাশের উপযোগী ভুবর্লৌকিক পদার্থসকল আকৃষ্ট করিয়া থাকে। উহারা তখন এই প্রকারে পরজন্মের তৃষ্ণা, কাম, প্রভৃতি হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ভুবর্লৌকিক পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য স্বর্লোকে যায় এবং মনুষ্য যে পরিমাণে সেই লোকের উপযোগী পবিত্র মানসিক চিত্রসকল গঠন করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে সেই সময় ঐ লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য এই পৃথিবীতে যে সকল ভূয়োদর্শন (experience) সংগ্রহ করিয়া

থাকে, স্বর্লোকে গিয়া সেই সকল ভুয়োদর্শন অন্তর্ভুক্ত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সেই ব্যক্তি পুষ্ট হইতে থাকে। মনুষ্যের ভুয়োদর্শন, তাহার মানসিক ছবিসকলের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। স্বর্লোকে মনুষ্য এক এক জাতীয় মানসিক চিত্রসমূহকে একত্র করিয়া উহাদের প্রত্যেকের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং চিন্তা দ্বারা মানসিক যন্ত্র প্রস্তুতকরিয়া উহাতে উক্ত সার পদার্থকে মানসিক বৃত্তিরূপে (Faculty) পরিণত করিয়া ঢালিয়া দেয়। যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি, জ্ঞানের জন্য উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়া মানসিক ছবিসকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর সে যখন দেহ ত্যাগ করিবে, তখন উক্ত ছবিসকলকে একত্র সংগ্রহ করিবে এবং উহাদের হইতে ক্ষমতা বা সামর্থ্য উদ্ভূত করিবে। উহার ফলে সে ব্যক্তি যখন পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিবে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিবৃত্তিমূলক (Intellectual) ক্ষমতাসকল (Faculties) লাভ করিবে। এই প্রকারে মানসিক ছবিসকলের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাহারা তখন মানসিক ছবিরূপে বর্ত্তমান থাকে না। তখন উহারা জীবের উন্নত ক্ষমতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু, জীব যদি কখন ঐ সকল ছবি দেখিতে চায়, তাহা হইলে চিত্রগুপ্তের খাতায় অর্থাৎ মহাকাশে চিত্রিত দেখিতে পাইবে। আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য যদি বর্ত্তমান মানসিক বৃত্তিসকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে উহাদিগকে পাইবার জন্য নিবিষ্টচিত্তে (deliberately) ইচ্ছা করিতে হইবে। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, একজন্মের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা, অপর জন্মে বৃত্তিতে (faculty) পরিণত হয় এবং কার্য্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা, কার্য্য-সম্পাদনসামর্থ্যে (Capacity) পরিণত হয়।

আমাদের যে সকল চিন্তা উচ্চধরণের নহে, ক্রমাগত সেই সকল সাধারণ চিন্তা করিলে, উহাদের ছবিসকল প্রবৃত্তিতে (Tendency) পরিণত হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কিছু চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ, তাহার ফলে মানসিক শক্তি এমন পথে প্রধাবিত হয়, যেখানে উহা কোন বাধা পায় না; উহারা তখন প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়।

সুযোগ না পাওয়াতে যদি কোন কার্য্যসম্পাদনের ইচ্ছা বা বাসনা বিফল হয় অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সামর্থ্য আছে, কিন্তু সুযোগ না পাওয়াতে উহাদের সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে ঐ কার্য্য-সম্পাদনের ইচ্ছা বা বাসনা, পরজন্মে চেষ্টনায় (action) পরিণত হইয়া থাকে। যেমন, যদি পুনঃপুনঃ পরের দ্রব্যের প্রতি লোভ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফলে মানসিক ছবি গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল ছবি সুবিধা পাইলেই চেষ্টনারূপে মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে মনুষ্য, চৌর্য্যরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্য এইরূপ কত বার বলিয়া থাকে যে, "এই কার্য্যটী আমার চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। যদি আমি চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে ঘটিত না।" এই কথাগুলি যে সত্য— তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, মনুষ্য তখন কোন পূর্ব্বচিন্তিত চিন্তাদ্বারা ঐ কার্য্য করে নাই।

মনুষ্য ইহলোকে যে সকল ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাদের স্মৃতি, মানসিক ছবিরূপে বিরাজ করে। এই সকল ছবি, জ্ঞানে (wisdom) পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্য, স্বর্লোকে ঐ সকল ছবিকে সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে যে, কোন্ কর্ম্ম করিলে সুখ হয় এবং কোন্ কর্ম্ম করিলে দুঃখ হয়। এই প্রকারে তাহার জ্ঞান (wisdom) লাভ হইয়া থাকে। এই স্থলেও মানসিক ছবিসকল জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন উহারা আর ছবিরূপে অবস্থান করে না।

ভূয়োদর্শনের মানসিক ছবির দ্বারা এবং বিশেষতঃ ক্লেশভোগের দ্বারা যে সকল ছবি গঠিত হয়, তাহাদের দ্বারা বিবেক (conscience) উৎপন্ন হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীব, সুখের আশায় মন্দ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু মোহবশতঃ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ করে। এই প্রকারে প্রতিহত হইয়া, যখন জীব মন্দ বিষয় হইতে সুখ পাইবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন অতীতের স্মৃতিসকল বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান (conscience) রূপে অবতীর্ণ হয় এবং আমাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে বাধা দেয়। সুতরাং কষ্ট-সংযুক্ত ভূয়োদর্শনই বিবেকে পরিণত হইয়া থাকে।

ভাবনা ও বাসনার পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা কর্ম্মের যে রহস্য অবগত হইলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা, সামর্থ্যে (Capacity) পরিণত হয়।

(২) পুনঃ পুনঃ চিন্তা, প্রবৃত্তিতে (Tendency) পরিণত হয়।

(৩) কার্য্য করিবার ইচ্ছাসমূহ, চেষ্টায় (Action) পরিণত হয়।

(৪) ভূয়োদর্শনসমূহ (Experiences), জ্ঞানে (Wisdom) পরিণত হয়।

(৫) কষ্টসংযুক্ত ভূয়োদর্শন, বিবেকে (Conscience) পরিণত হয়।

মনুষ্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্বর্লোকের ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিলে পর, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এই মরলোকে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য ভুবর্লোক হইতে যখন স্বর্লোকে যায়, তখন তাহার ভুবর্লৌকিক শরীর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। তখন কামনাপ্রসূত ছবিসকল (Desire images) গূঢ় ভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং যখন স্বর্লোক ত্যাগ করে, তখন স্বর্লোকীয় শরীর অর্থাৎ মনোময় কোষের কতক অংশ ত্যাগ করিয়া থাকে। সেই সময় পূর্ব্বকার মানসিক ছবিসকল (Mental Images), নূতন বৃত্তিসমূহ (Faculties) সৃষ্টি করে। এই সময় তাহার মনোময় কোষের পরিবর্ত্তন ঘটে। পুরাতন অংশ কতক পরিত্যক্ত হয় এবং নূতন বৃত্তিসকল সংযোজিত হইয়া থাকে। এই প্রকার নূতন মনোময় কোষ লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করিতে আসিয়া থাকে। এই স্থানে হইতেই অতীতের কর্ম্মফল ফলিতে থাকে। পূর্ব্বকার গূঢ়ভাবে সঞ্চিত কামনা-প্রসূত ছবিসকল (Desire images) তাহাদের চতুর্দ্দিকে তাহাদের উপযোগী ভুবর্লৌকিক পদার্থসকল আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং নূতন জন্মের উপযোগী ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এবং অনুরাগসকল (Emotions) সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই স্থানে মনুষ্য তাহার কর্ম্মফলপ্রসূত আবরণে মণ্ডিত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের অধীশ্বর দেবগণ যতক্ষণ তাহার উপযোগী প্রাণময় কোষ এবং অন্নময় কোষ প্রস্তুত না করিয়া দেন, তত দিন অবস্থান করে।

এই সকল কর্ম্মের অধীশ্বর বা লিপিকগণ, প্রাণময় এবং অন্নময় কোষের

এমন ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া দেন যে, তাহার দ্বারা তাহার পূর্ব্বকার কর্ম্মের ভোগ কতক পরিমাণে হইতে থাকে। এই কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। মনুষ্যের একটীমাত্র এমন কোন শারীরিক উপাধি বা যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না যে, তাহার দ্বারা তাহার অতীতের সকল কর্ম্মের ভোগ হইতে পারিবে। সেই জন্য এক জীবনে যথাসম্ভব অতীতের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য, লিপিকগণ আমাদের স্থূল শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। বর্ত্তমান জীবনে ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অতীত কর্ম্মের নামই—প্রারব্ধ কর্ম্ম।

চিন্তা দ্বারা কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। চেষ্টার (Actions) দ্বারা কিরূপে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ (Environment) প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) মনুষ্য তাহার চেষ্টার দ্বারা পার্থিব লোকে অপর মনুষ্যকে নিয়মিত করিতে পারে। সে হয় সুখ, না হয় দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকে। মনুষ্য শুভ, অশুভ অথবা শুভাশুভ-মিশ্রিত উদ্দেশ্যে (Motive), সুখ অথবা দুঃখের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারে। কেবলমাত্র পরোপকারের জন্য, অর্থাৎ, তাহার স্বজাতিকে সুখ প্রদান করিবার জন্য সে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে—যেমন নগরে একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারে। অপর কোন ব্যক্তি হয় তো শুভাশুভমিশ্রিত অর্থাৎ স্বার্থাস্বার্থজড়িত উদ্দেশ্যে একটী উদ্যান দান করিতে পারে। অপর এক ব্যক্তি অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যেমন রাজপুরুষগণের নিকট উচ্চ খেতাব পাইবার আশায়, অথবা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট বাহবা পাইবার আশায় ঐরূপ একটী উদ্যান দান করিতে পারে। এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য (Motive) পরজন্মে ঐ তিন ব্যক্তির চরিত্র, কেবলমাত্র উন্নতির পথে, উন্নতি ও অবনতির মিশ্রিত পথে, অথবা কেবলমাত্র অবনতির পথে নিয়মিত করিবে। কিন্তু উহাদের চেষ্টার (action) ফল একই প্রকারের হইবে। ঐ তিন ব্যক্তি বহুলোককে পার্থিব সুখ দিয়াছে বলিয়া পরজন্মে পার্থিব সুখকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা পার্থিব অর্থের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া পার্থিব ফল পাইবে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, উহারা ধন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যতিরেকে অন্য সুখ পাইবে কি না, তাহা উহাদের চরিত্রের উপর

নির্ভর করিতেছে। যে ব্যক্তি পরোপকারের জন্য দান করিয়াছে, সে সুখ পাইবে, যে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া দান করিয়াছে, সে দুঃখ পাইবে, এবং যে ব্যক্তি উভয় প্রকারে জড়িত হইয়া দান করিয়াছে, সে মিশ্র ফল অর্থাৎ অল্প সুখ পাইবে।

(২) যে ব্যক্তি পরোপকারের জন্য যথাসম্ভব সুবিধানুসারে কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি পরজন্মে তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা পাইয়া থাকে। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি যথাসম্ভব সুবিধানুসারে দান করে, তাহা হইলে সে পরজন্মে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে যে, তখন দান করিবার সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

(৩) পুনশ্চ, আমরা যদি কর্ম্মের সুযোগকে অবহেলা করি, তাহা হইলে পরজন্মে উহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দুঃখরূপে পরিণত হইবে। ঐরূপ অবহেলার ফলে প্রাণময় কোষের মস্তিষ্ক নির্দ্দোষতার সহিত গঠিত হইবে না। সুতরাং স্থূল মস্তিষ্কেরও বিকলতা বা ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তখন জীব যদি কোন কার্য্যসম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠান করে, তখন সে দেখিবে যে, হয় তো তাহার কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। যে সকল সুবিধাকে অবহেলা করা যায়, তাহারা বিফল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়; তখন তাহারা এমন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয় যে, তাহাদের আর পরিস্ফুটন হয় না। তখন সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকে, অথচ সামর্থ্য থাকে না।

(৪) আমাদের ভালবাসার পাত্রস্বরূপ শিশুগণকে আমরা যদি অবহেলা করি, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মফল ফলিবে। যে ভালবাসার পাত্র, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে, পরজন্মে এরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যে, তখন সেই ভালবাসার পাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে এবং হয় তো তাহার সহিত ভালবাসার সূত্রেও বিশেষ ভাবে আবদ্ধ থাকিবে; কিন্তু তাহারই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলে, তাহার ভালবাসার পাত্র, অকালে তাহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে আত্মীয় কুটুম্বকে ঘৃণা করা যায়, সেই আত্মীয়-কুটুম্বই হয় তো বংশধর, স্নেহের পুত্তলী, একমাত্র আশাভরসাস্থল, পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে পারে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাহার পিতামাতাকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। তখন

তাহার পিতামাতা গৃহকে মরুভূমীবৎ মনে করে এবং বলে যে, "ভগবানের কি অন্যায় বিচার! বহুপুত্রবান্ প্রতিবেশীদিগের কোন সন্তানই মরিল না, কেবল আমার আশাভরসার স্থল একমাত্র সন্তানই মৃত্যুমুখে পতিত হইল!" কিন্তু সকলে অবগত আছেন যে, ভগবানের বিচার অন্যায় নহে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। অশুভ কর্ম্মের জন্য, অশুভ ফলভোগ করিতে হয়।

(৫) নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অথবা অপরের ক্ষতি করিলে, কর্ম্মের অধীশ্বরগণ মনুষ্যের প্রাণময় কোষ এইরূপ অঙ্গহীন করিয়া নির্ম্মাণ করেন যে, সেই প্রাণময় কোষের জন্য স্থূল অন্নময় দেহও অঙ্গহীন হয়। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ পাগল এবং কেহ রোগভোগী হইয়া থাকে। কর্ম্মের অধীশ্বরগণ তাহাকে এইরূপ পিতা-মাতার সংস্রবে আনয়ন করেন যে, বিশেষ কর্ম্মফলের ভোগে বিশিষ্ট রোগ অথবা বিকলতা তাহার শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে। তখন পৈতৃক ধর্ম্ম, অপত্যে সংক্রমণ (Heredity), এই নিয়মানুসারে তাহারও বিশিষ্ট রোগ বা বিকলতা হইয়া থাকে।

(৬) যাহারা কলাবিদ্যার বৃত্তিগুলির পুষ্টিসাধন করেন, তাহাদিগকেও লিপিকগণ এমন অবস্থায় এবং এমন বংশের ভিতর প্রেরণ করেন, যেখানে 'পৈতৃক ধর্ম্ম, অপত্যে সংক্রমণ' এই নিয়মানুসারে তাহাদের বৃত্তির পরিস্ফুটনের সুবিধা হইয়া থাকে।

(৭) যাহারা বহু লোককে একত্র সাহায্য করেন,—যেমন কোন উচ্চ-ধরণের পুস্তক লিখিয়া, বক্তৃতা প্রদান করিয়া, কিংবা কলমের অথবা বাক্যের সাহায্যে উচ্চধরণের ভাবসকল বিস্তার করিয়া—তাঁহারাও তাঁহাদের কর্ম্মের ফল, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক সাহায্যরূপে পাইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যেরূপ ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কার্য্যও করিতে হইবে। যেমন, যদি ধনস্পৃহা থাকে, তাহা হইলে বদান্য হইতে হইবে; যদি কোন কৃপণ কেবল-মাত্র তাহার ধনাগার পূর্ণ করে, তাহা হইলে সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি ইহজন্মে তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে সাহার্য্য করে, তাহা হইলে পরজন্মে এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে যে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে সাহায্য করিবে। যে ব্যক্তি তাহার বন্ধুবান্ধবপ্রভৃতির উপর

নির্দ্দয় হয়—সে, পরজন্মে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভবিষ্যতের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহাকে ইহজন্মে সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মের নিয়ম।

কর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম যে, মনুষ্য যেরূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা (motive) কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার ফল ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিণত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পরোপকার করিবার জন্য এক জন ব্যক্তির যথার্থ বাসনা আছে। তাহার উদ্দেশ্য, সৎ এবং পবিত্র। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন সদুদ্দেশ্যের সহিত এক ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে গেল, তখন জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই ব্যক্তি সাহায্যের পরিবর্ত্তে কষ্ট দিয়া ফেলিল। এইরূপ কর্ম্মের দুইটী ফল ফলিবে। প্রথম, উদ্দেশ্য—সৎ এবং পবিত্র হওয়াতে তাহার চরিত্র অনেক পরিমাণে সৎ এবং পবিত্র হইবে। কিন্তু কষ্ট দিয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা কষ্ট পাইবে। যদি ঐ ব্যক্তি কার্য্য করিতে গিয়া কাহাকেও কষ্ট না দেয়, তাহা হইলে পার্থিব সুখ এবং সৌভাগ্য উপভোগ করিবে।

কিন্তু যদি কেহ মন্দ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করে, এবং উহার ফলে সাধারণ লোকের যদি সুখ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পরজন্মে সুখপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইবে। কিন্তু উদ্দেশ্য মন্দ হওয়াতে তাহার চরিত্র মন্দ হইবে। যদি মন্দ উদ্দেশ্যের ফলে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দুঃখময় হইবে এবং চরিত্রও মন্দ হইবে।

কর্ম্মরহস্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমরা এইবার বুঝিতে পারিলাম। মনুষ্য যে তিন প্রকার শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপযোগী লোকে কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক মনুষ্য এবং কর্ম্মের অধীশ্বরগণ ভাগ্যগঠনসম্বন্ধে কে, কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তাহাও অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিলাম। ভাগ্যগঠনসম্বন্ধে মনুষ্য উপকরণসকলের সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু উপকরণসকলের তারতম্যানুসারে লিপিক অথবা মনুষ্য উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকে। মনুষ্য, নিজে চরিত্র

গঠন করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; কিন্তু লিপিকসকল, মনুষ্যের জন্য এমন ছাঁচ প্রস্তুত করেন, এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর মনুষ্যকে প্রেরণ করেন এবং এমন ভাবে তাহকে স্থাপিত করেন যে, কর্ম্মের নিয়মের অলঙ্ঘ্য ফল ফলিয়া থাকে। লিপিকগণের কেন প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

—০———

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

(দৈব ও পুরুষকার)

—০ঃ)*(ঃ০—

পূর্ব্বে আমরা কর্ম্মসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কর্ম্মের তিনটী বিভিন্ন উপাদান পাইয়াছি। যথা—(১) হঠ, (২) দৈব এবং (৩) পুরুষকার। হঠবাদীরা কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, দৈব ও পুরুষকারের সমালোচনা পরে করা যাইবে। হঠবাদীরা বলেন যে, এই বিশ্ব 'অকস্মাৎ' উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'সঙ্ঘটন' বা (Result of chance) বলেন। কিন্তু যাঁহারা জগৎকে 'অকস্মাৎ উৎপন্ন' বলিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি অতীব হেয়। তাঁহারা কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহাতে আর দ্বিধা নাই। তবে তাঁহারা বলেন যে, উহা 'অকস্মাৎ উৎপন্ন'; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে কার্য্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহা কোন হেতু বা কারণের অপেক্ষা করে না। কার্য্য, বিনা হেতুতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, কার্য্যের উৎপত্তি যদি হেতুসাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা সর্ব্বদা উৎপন্ন হয় না কেন? উৎপত্তিসময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন? সুতরাং বিনা হেতুতে কার্য্যোৎপত্তিরূপ আকস্মিকতা সম্ভবপর নহে। হঠ, যদি উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের ন্যায়, মধ্য বা বর্ত্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান

কালের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং ঐরূপ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। হঠ অর্থে যদি কার্য্যস্বাত্মহেতুক বলা যায়, অর্থাৎ কার্য্যই, যদি কার্য্যের হেতু হয়,—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, বিদ্যমান থাকে—তাহা হইলে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবের বিরোধ হয়। এক পদার্থই পূর্ব্ব এবং এক পদার্থই অপর হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থও সারহীন। অতএব হঠবাদীদের মত যে অন্তঃসারশূন্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কর্ম্মের আর দুইটী কারণ, অর্থাৎ দৈব ও পৌরুষসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাঁহারা কেবলমাত্র দৈবকে, অথবা কেবলমাত্র পুরুষকারকে জীবনসমস্যার একমাত্র কারণ বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাদের মত, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কেবল যদি দৈবেরই কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই স্নান, দান ও মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? কেননা, দৈব সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শবত্ব ব্যতীত এই জগতে নিস্পন্দভাব আর কাহারও দেখা যায় না। এই সংসারে কেবল দৈবই যদি জীবসমূহের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই সমুদয় করিবে। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষিগণ যাহাকে চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি ছিন্নমস্তক হইলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে বলিব দৈব আছে; কিংবা দৈবজ্ঞগণ যাহাকে বলিয়াছেন যে, "এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে," কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিব—দৈব আছে।

বশিষ্ঠদেব নিম্নোক্তপ্রকারে পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। * আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষার্থের দ্বারা যখন কোন কর্ম্মের ফলোদয় হয়, তখন তিন প্রকারে পুরুষার্থের বিকাশ হয়। যথা :—

"সংবিৎস্পন্দো মনঃস্পন্দ ঐন্দ্রিয়স্পন্দ এব চ।
এতানি পুরুষার্থস্য রূপাণ্যেভ্যঃ ফলোদয়ঃ॥

* যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষুপ্রকরণ—৪র্থ হইতে ৮ম সর্গ।

যথা সংবেদনং চেতস্তথা তৎ স্পন্দমৃচ্ছতি।
তথৈব কায়শ্চলতি তথৈব ফলভোক্তৃতা॥”

(যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু—৭—৪, ৫)

অর্থাৎ, প্রথমতঃ সংবিৎস্পন্দ হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ মনঃস্পন্দ হয় অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনের ইচ্ছা হয় এবং অবশেষে ইন্দ্রিয়স্পন্দ অর্থাৎ অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই তিনটী পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্তও তাদৃশ স্পন্দপ্রাপ্ত হয়, শরীরচেষ্টাও তদবধি হইয়া থাকে। ফললাভও তাদৃশ হইয়া থাকে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, বৃহস্পতি, পুরুষকারফলে দেবগুরু এবং শুক্রাচার্য্য পুরুষকারফলে দৈত্যগুরু হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতেও যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব—জীববিশেষ, পুরুষকারনামক প্রযত্নের ফলেই সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীবই পুরুষকারনামক প্রযত্নেই কমলাসনে ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ, স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকারবলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহসংসারে কোন এক প্রাণী, পুরুষকারনামক প্রযত্নবলেই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্যাসাদি ঋষিগণ পৌরুষবলেই মুনি হইয়াছিলেন; দৈত্যাধিপতিগণ কেবল পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন এবং সুরপতিগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন—বিশীর্ণ হইয়া এই বিশাল জগৎ আহরণ করিয়া লন।

সেই পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান বা ঐহিক। দৈব, পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে এই কর্ম্মে এই ফল হয়—এই প্রকার বাক্যই দৈবনামে প্রসিদ্ধ। কর্ম্মনির্ব্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে দৈবকল্পনা নিরর্থক। যদি দৈব উক্ত প্রকার বুদ্ধিই হয়, তবে বুদ্ধি হইতে তাহার প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ দৈব একটা স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা বলা চলে না। কোন দুই ব্যক্তির কর্ম্মনির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি সমান, দুই জনেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু একজনের আশা পূর্ণ হয় নাই, আর একজন পূর্ণ-

মনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না, দৈব—এইরূপ কল্পনা-বলে দৈব প্রমাণকরতঃ তাদৃশ বৈষম্যের কারণস্বরূপে পৌরুষকেই কল্পনা না কর কেন? পৌরুষ কল্পনায় দোষ কি? হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পুরুষপ্রবরগণ দারিদ্র-দুঃখ-শোকে কাতর হইয়াও, পুরুষকারপ্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু পৌরুষবলেই দৈত্য-বিজয়, জগৎ-সংস্থান ও জগৎ রচনা করিয়াছেন, দৈববলে নহে। ফলশালী পৌরুষ দ্বারা যে শুভ ও অশুভ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈব শব্দে নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ, পুরুষার্থ-অনুসারে শুভ বা অশুভ ফলপ্রাপ্তি হইলে, লোকে কথায় বলে 'ইহার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল'—এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কর্ম্ম-ফলপ্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, "আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল," "এইরূপ নিশ্চয় হইল তবে ফল লাভ হইল."—এই উক্তিই দৈব কল্পনার মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে "এই প্রাক্তনকর্ম্মই এই ফলের প্রদাতা"—এই প্রকার আশ্বাসবাক্যই দৈব।

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন যে, পুরুষকার প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ইহা ফলবান্ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্ত্তারই তৃপ্তি লাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে দুরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। বারংবার চেষ্টা দ্বারা স্বার্থলাভ, পুরুষকারের ফল। অতএব যাহারা প্রত্যক্ষ, দৃষ্ট, অনুভূত, শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীকে দৈবায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই সকল কুমতি মানবগণের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল।

সুতরাং প্রাক্তন পৌরুষ বা কর্ম্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র দৈব নাই। দৈব, কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐহিক বা বর্ত্তমান এবং প্রাক্তন পুরুষকার-দ্বয়, মেষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করে; যাহার শক্তি অক্ষম হইয়া পড়ে, সেই নিরস্ত হয় এবং যাহার বল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। যেমন দুঃখের সময় লোকে দুঃখে "হা কষ্ট" বলিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বতন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া লোকে "হা অদৃষ্ট" বলিয়া থাকে।

প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ প্রবল ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা সেই দৈবকেও জয় করা যাইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কার্য্যবান্ হইবে, তাহার পৌরুষবলে করস্থিত আমলকের ন্যায় ফল দৃষ্ট হইবে। মূঢ়ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই পুরুষকারের অবধি আছে কি না? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষকারের পরিমাণ আছে। যদিও মহাচেষ্টা করিলেও, প্রস্তর হইতে রত্নলাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মের প্রযত্ন করিলে উহা কখন নিষ্ফল হয় না, তবে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে সমান জল ধরে, তাহা নহে এবং যেমন পটেরও পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বস্ত্র হইলেই যে, সকলের পরিধানের জন্য সমান দীর্ঘ কিংবা উপযুক্ত হয়, তাহা নহে; তদ্রূপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু, তাহা নহে; পুরুষার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। কর্ম্মের স্বভাবই এইরূপ যে, পুরুষার্থ অবলম্বন করিলে, যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে।

বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈবের নিন্দার দ্বারা পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও কেবলমাত্র পুরুষকার যে, সকল সময় ফলবান্ হয়, তাহা নহে। কারণ, পুরুষকারেরও অবধি আছে। কেবলমাত্র দৈবের দ্বারাও যে কোন কার্য্যসাধন হয় না, তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, দৈব ও পুরুষকারসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমাদের মনে স্বতঃ তিনটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। যথা :—

(১) আমাদের পুরুষকার নিরবধিক কি না? অর্থাৎ আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি কি না? অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) আছে কি না?

(২) আমরা দৈবায়ত্ত কি না? অর্থাৎ আমরা অদৃষ্ট বা অবশ্যম্ভাবিতার (Necessity) রাজত্বের অন্তর্গত কি না?

(৩) মনুষ্যের ক্রমবিকাশের পথে ইহাদের উভয়ের স্থান আছে কি না?

এই তিন মতের মীমাংসা করিতে গেলে, "জীবের স্বাধীনতা কত দূর"?— এই প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাইবে।

আমাদের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের জীবনের প্রত্যেক সোপানের সম্মুখে যে সকল বহুবিধ পথ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে আমাদের পছন্দের (Choice) স্বাধীনতা আছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। বিবেকী পুরুষমাত্রেই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কারণ, যদি মনুষ্য তাহার নিজ কার্য্যের জন্য সুখ অথবা দুঃখভোগ না করিয়া, কোন বাহ্য ক্ষমতা অর্থাৎ দৈবের দ্বারা চালিত হইয়া তাহার নিজের প্রত্যেক চিন্তার ও কার্য্যের কর্ত্তৃস্বরূপে নিজেকে অবগত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষমতা বা দৈব, কখন ন্যায়বান্ হইতে পারে না।

পরন্তু আমরা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, দৈব-বাদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার 'গণ্ডি' যদি আমরা অতি প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা সকলে দৈবকে মানিয়া চলি। আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য বাল্যাবধি যে প্রকার অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সেই প্রকার হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি পাপের ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে পাপী হয় এবং যে ব্যক্তি সদবস্থার ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে সৎ হয়। যে ব্যক্তি পাপী হয়, সে মনে করিতে পারে যে, ভাল পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (Choice) তাহার ছিল, অথবা যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা হয়, সেও মনে করিতে পারে যে, মন্দ পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (Choice) তাহার ছিল। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা ঐরূপ করে নাই, কারণ তাহারা দৈবেরই আয়ত্তে রহিয়াছে। অবশ্যম্ভাবিতার (Necessity) রাজত্বে বাস করিতেছে বলিয়া তাহারা ঐরূপ পাপী অথবা পুণ্যাত্মা হইয়াছে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় মতদ্বয়কে একেবারে খণ্ডন করা অথবা একেবারে স্থাপন করা যাইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় মতটী আমাদের গ্রাহ্য। কারণ, উহা পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে এবং মানবীয় ও ঐশ্বরিক প্রকৃতি যে এক ও কর্ম্ম এবং জন্মান্তরগ্রহণ যে বিশিষ্ট নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে,—তাহা প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। এই সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে গেলে, জীবের স্বাধীনতা কত দূর?—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা পাওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ধারাবাহিক যুক্তি দ্বারা আমরা ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১। প্রথমতঃ, দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাউক। ইহজন্মে বাসনা দ্বারা আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহাকে পুরুষকার বলে। আর পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল কর্ম্মের ফল, আমাদের দেহমধ্যে স্বতঃ প্রকাশ পাইতে বাধা পায়, তাহা অন্য দ্বারা বা নিজের মধ্যেই অনিচ্ছাবশতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে দৈবকর্ম্ম বা দৈব বলে। দৈব আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে অনুষ্ঠিত এবং পুরুষকার আমাদের হস্তগত। দৈব আমাদের চতুর্দ্দিকে 'গণ্ডি' (Limitations) প্রদান করে, পুরুষকার ঠিক্ উহার বিপরীত। যখন আমরা পুরুষকার প্রয়োগ করি, তখন আমাদের স্বাধীনতা থাকে। এই জন্য পুরুষকারকে Free will বা স্বাধীন ইচ্ছা এবং দৈবকে Necessity বা অবশ্যম্ভাবিতা, অথবা Limitations বা 'গণ্ডি' বলা হয়। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই 'গণ্ডি' আমাদেরই কৃত।

২। আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হই যে, কেবলমাত্র এক অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ, অদ্বিতীয়, চিন্ময়, দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। তিনিই নিরবধিক (absolutely) স্বাধীন।

৩। যখন তিনি মায়োপাধিক হইয়া এই বিশ্বরচনা করেন, তখন তাঁহার দুইটী বিভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরুষ (spirit) ও প্রকৃতি (matter), চৈতন্য (life) ও জড় (form),—একই চিৎ, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, একই বহু হইয়াছেন।

৪। সেই এক সত্তের নিরবধিক (absolute) ইচ্ছার উপর, বহুর আপেক্ষিক (relative) স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপেক্ষিক (Relative) স্বাধীন ইচ্ছা বলিলে, 'গণ্ডি' (Limitations) বা সীমা বুঝাইয়া থাকে। যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি—আত্মা ও অনাত্মা—একই পরব্রহ্মের দুইটী বিভাবমাত্র, উহারা যেমন একই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেইরূপ স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা পুরুষকার এবং দৈব (Necessity), নিরবধিক (Absolute) ইচ্ছারূপ একই তত্ত্বের দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্রমাত্র।

৫। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপানে যদিও দৈব এবং পুরুষকারের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা পরস্পরে অন্যূনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। দৈব ভিন্ন পুরুষকার থাকে না, পুরুষকার ভিন্ন দৈব থাকে না।

জড় ও চৈতন্যের ভিতর কি পার্থক্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা অবগত হই যে, আমরা যত স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা দেখিতে পাই যে ইহাদের পার্থক্যের হ্রাস হয়। এই পার্থিব ভূমিতে উহাদের পার্থক্য সকলের অপেক্ষা অধিক। বিকাশের উচ্চতম ভূমিতে এই পার্থক্য অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন জড় ও চৈতন্য সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিমজ্জিত হয়, তখনই এই পার্থক্যের লোপ হয়। দৈব ও পুরুষকারেরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র রূপ 'গণ্ডি'-বিশিষ্ট পার্থিব লোকেই দৈব ও পুরুষকারের পার্থক্য অধিকপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বের অন্যান্য ভূমিতেও এই পার্থক্য ন্যূনাধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্ সৎ বস্তুরই, নির্ব্বিশেষ ইচ্ছা (absolute will) আছে বলিয়াই, এই ব্যক্ত বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা অর্থাৎ পুরুষকার আপেক্ষিক (relative) বলিয়া উল্লিখিত হয় ; কারণ কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্ সৎ বস্তুকেই নির্ব্বিশেষ ইচ্ছা (absolute will)-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা যায়; এই সৎ বস্তু, পুরুষ কিম্বা প্রকৃতি নহে, দৈব বা পুরুষকার নহে, কিন্তু ইহা প্রকাশমান্ অবস্থায় যেমন মূলভিত্তি, তেমনি ঐ দুয়েরই মূল-ভিত্তি।

৬। পরমাত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম যেমন স্বকৃত বিশ্বরূপ "গণ্ডির" মধ্যে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন, জীবাত্মাও সেইরূপ স্বকৃত গণ্ডির মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন।

৭। ক্রমবিকাশের আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে, মানব-রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টা (Individual free will) আছে; কিন্তু অন্যান্য নিম্ন রাজত্বে ঐরূপ স্বাধীন চেষ্টা নাই। একমাত্র ঐশ্বরিক ইচ্ছা (Divine will)-অনুসারে ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে। যদিও ক্রম-বিকাশের গতিকে বাধা দিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই, তথাপি ক্রমবিকাশের নিয়মের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা মনুষ্যের আছে। মনুষ্য তাহার ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের বেগ বর্দ্ধিত করিতে অথবা হ্রাস করিতে পারেন। মনুষ্যের ক্রমবিকাশ বিশ্বের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় নিম্নজীবের স্বাধীনতা নাই, তাহারা স্বকৃত চেষ্টার দ্বারা ক্রম

বিকাশের বেগকে বাধা দিতে পারে না। তাহারা নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া ক্রমবিকশিত হইয়া থাকে। নিম্নজীবরাজত্বের ইচ্ছা এবং জ্ঞান ক্রমবিকশিত হইয়া মানব-রাজত্বের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা পুরুষ-কার এবং আত্মজ্ঞানে (Self-consciousness) পরিণত হয়।

৮। মনুষ্যগণ আপনাদের কার্য্যের জন্য দায়ী। পার্থিব (Physical), নৈতিক (Moral), এবং মানসিক (Mental) শক্তিসমূহের সমবায়ে মনুষ্য যে কার্য্য করে, তাহার সাধারণ নাম "কর্ম্ম"।

৯। আমাদের অবস্থাসমূহ আমাদের কর্ম্মেরই ফলমাত্র, ইহারা আমাদের জন্য 'দৈব' (necessities) রূপ 'গণ্ডি' সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার স্বকৃত 'গণ্ডির' মধ্যে আমাদের ইচ্ছা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। এই 'গণ্ডির' বাহিরে আমাদের ইচ্ছা যাইতে না পারিলেও, এই 'গণ্ডিকে' প্রশস্ত অথবা সঙ্কুচিত করিতে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে।

১০। বন্ধনের কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং মোক্ষের কারণ হইতেছে জ্ঞান। পুনর্জন্মগ্রহণের দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে এবং তাহার সহিত জ্ঞান সঞ্চয় ও স্বাধীন-ইচ্ছা বা পুরুষকারের বৃদ্ধি করিতে থাকে।

১১। নিম্নজীবসকল নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য অন্য প্রকারে ক্রমবিকশিত হয়। তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করাতে, সে তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকে। সে যত ঠেকে, তত শিক্ষা করে। এই শিক্ষার ফলে সে জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বুঝিতে পারে যে ঐশ্বরিক ইচ্ছার (Divine will) সহিত মিলিয়া কার্য্য না করিলে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার আর অন্য উপায় নাই।

১২। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই বদ্ধজীব; কারণ তাহাদের দ্বৈত জ্ঞান থাকাতে তাহারা নিজের স্বার্থের জন্য কার্য্য করিতে গিয়া মানবীয় ক্রম-বিকাশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা জ্ঞানী, তাহারা ঐশ্বরিক ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দেয়, সুতরাং তাহারা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা "জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?"—এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। তত্ত্বজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানেরা "দৈব" রূপ 'গণ্ডি' সৃষ্টি করিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই স্বকৃত 'গণ্ডির' মধ্যেই তাহার স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, সে তখন বুঝিতে পারে যে তাহার পুরুষকার থাকিলেও, উহার অবধি আছে। মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য নিম্ন রাজত্বের জীবের স্বাধীনতা একেবারে নাই বলিলেই চলে।

'দৈব' সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"Those who believe in *Karma* have to believe in *destiny*, which from birth to death every man is weaving thread by thread around himself, as a spider does his web......... When the last stand is woven, and man is seemingly enwrapped in a network of his own doing, then he finds himself completely under the empire of this *self-made* destiny. It then fixes him like the inert shell against the immovable rock, or carries him away like a feather in a whirlwind raised by his own actions."—*Secret Doctrine*, Vol. I., P. 639.

শাস্ত্রেও ঠিক্ এই প্রকার একটী উপদেশ আছে যে,—মৃত্তিকাকে নরম অবস্থায় কুম্ভকার যথেচ্ছ গঠন করিতে পারে; কিন্তু সেই মৃত্তিকা যখন শুষ্ক হয়, তখন উহা লৌহের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে। সেই প্রকার অদৃষ্ট অথবা দৈব সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। আজ আমরা দেখিতেছি যে অদৃষ্ট আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য কল্য উহার উপর আধিপত্য করিয়াছিল। সেইজন্য বলা হইয়া থাকে যে পুরুষকার আমাদের হস্তগত, কিন্তু দৈব হাত ছাড়া হইয়াছে। এই হেতু মহাভারতে ভীষ্ম দৈবাপেক্ষা পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কর্ণও বলিয়াছিলেন যে,—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥"

অর্থাৎ, আমি সূতই হই বা সূতপুত্রই হই, যে কেহ হই না কেন, দৈবায়ত্ত কুলে আমার জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত, অর্থাৎ মনুষ্যত্বেই

আমার প্রকৃত পরিচয়। প্রাক্তন কর্ম্মের জন্য মনুষ্যের যে বংশাদিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ (environments) হইয়া থাকে, তাহা কর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। দৈব আমাদের অনুকূল অথবা প্রতিকূল, তাহা উপস্থিত না হইলে বুঝা যায় না, তাহা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যায় না, এজন্য তাহাকে 'অদৃষ্ট' বলা হয়। অদৃষ্ট দৈব যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহার প্রতীকার না করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রতিকূল দৈব উপস্থিত হয়, তবে পুরুষকার দ্বারা অন্য কোন দৈব সাধন করতঃ, তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। দৈব যখন আমারই জন্মান্তরীণ কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন আমার এক্ষণকার কর্ম্ম দ্বারা, তাহা রহিত বা পরিবর্ত্তিত না হইবে কেন?

দৈবের দোহাই দিয়া নিজের মনুষ্যত্ব লোপ করা যে উচিত নহে, দৈব যে পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না, সুতরাং পুরুষকার যে একমাত্র গতি—তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দুই একটী বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা॥
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥
উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"—হিতোপদেশ

অর্থাৎ দৈবের দোহাই দিয়া থাকা উচিত নহে। বিনা যত্নে তিল হইতে তৈল বাহির হয় না। উদ্যোগী পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীকে লাভ করিয়া থাকেন; কাপুরুষেরা দৈবের উপর সদা নির্ভর করিয়া থাকে। দৈবকে নিহত করিয়া যথাসাধ্য পুরুষকার প্রয়োগ করা উচিত। যত্নের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও যদি কর্ম্ম, সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কাহারও দোষ নাই। একটীমাত্র চক্রের দ্বারা যেমন শকট চালিত হয় না, সেইরূপ পুরুষকার বিনা দৈব ফলে না। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড লইয়া ইচ্ছামত বিচিত্র আকার গঠন করিয়া থাকে, মনুষ্য তেমন আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া আপনার কার্য্যের ফল আপনিই ভোগ করিয়া থাকে। কাকতালীয়বৎ যদি কেহ সম্মুখে কোন নিধি দেখিতে পায়, তাহা হইলে দৈব কি তাহা হস্তে তুলিয়া দেন? কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করিতে হইবে, পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। উদ্যম ভিন্ন ইচ্ছায় কোন কার্য্য হয় না। সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ কখন আপনি আসিয়া প্রবেশ করে না।

শাস্ত্রে মনুষ্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই পিঞ্জরের দণ্ডগুলি অতি নমনীয়; সুতরাং ইচ্ছামত পিঞ্জরকে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। পক্ষী যেমন স্বাধীনভাবে ঐ পিঞ্জরের ভিতর উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু পিঞ্জরের বাহিরে যাইতে পারে না, মনুষ্যও ঠিক্ সেই প্রকার স্বকৃত দৈব (necessity)-রূপ গণ্ডির বা পিঞ্জরের ভিতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারে না, অথবা উহাকে ভগ্ন করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি পিঞ্জরের ভিতর হইতে চাপ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে পিঞ্জর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উহা অবশেষে এমন বর্দ্ধিত হইবে যে, উহা তখন বিশ্বের ন্যায় প্রশস্ত হইবে। তখন ঐ পিঞ্জরের দণ্ডসকল অন্তর্দ্ধান করিবে এবং আমরাও যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিব। আমরাই আমাদের পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছি এবং আমরাই আমাদিগকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু যুগ-যুগান্তর, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা ঐ পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছি, সুতরাং এক জন্মে যে আমরা ঐ পিঞ্জর ভগ্ন করিব, এইরূপ সামর্থ্য আমাদের কোথায়?

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দৈবের খণ্ডন হয় কি না, ইহারও উত্তর

আমরা পাইলাম। পুরুষকারের দ্বারা দৈবের খণ্ডন হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষকার, মেষ-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহার বল অধিক হয়, তাহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষকারের আধিক্যের দ্বারা যে, দৈবের খণ্ডন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? এই জন্য শাস্ত্রে দুই প্রকার পুরুষকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—শাস্ত্রানুশাসিত ও শাস্ত্রবহির্ভূত। শাস্ত্রানুশাসিত পুরুষকারের দ্বারা জয়লাভ হয় এবং শাস্ত্রবহির্ভূত পুরুষকারের ফলে বিফলমনোরথ হইতে হয়।

ব্যক্তিগত কর্ম্মের দুইটী উপকরণ দৈব ও পুরুষকারের আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মনুষ্য নিজেই ঐশীশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং স্বাধীন; কিন্তু মায়ামোহে আবদ্ধ থাকা বশতঃ দৈবোপহিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহার স্বাধীনতার হ্রাস হইয়াছে। মনুষ্য যখন মায়া ছিন্ন করিবে, তখন অসীম স্বাধীনতা উপভোগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী উপকরণ ভিন্ন 'হঠ'কে কর্ম্মের তৃতীয় উপাদান কেন ধরা হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেল, দৈব ও পুরুষকার ভিন্ন যে 'হঠ' বা আকস্মিকতা আছে, তাহা অনেকের নিকট প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য দেখিতে পায় যে, সে যখন পুরুষকার প্রয়োগ করে, তখন কতক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে এবং কতক বিষয়ে করে না, এই জন্য সে পুরুষকার ভিন্ন দৈবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। মনুষ্য আরও দেখিতে পায় যে, এমন কতকগুলি বিষয় সংঘটিত হয়, যাহা আকস্মিকমাত্র। তাহাকে দৈব অথবা পুরুষকারের ভিতর সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় না। কিন্তু দৈবের ন্যায় হঠও যে অবিদ্যাকল্পিত, তাহা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। আমাদের প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক বাসনা এবং প্রত্যেক চেষ্টা—যাহাদের সমষ্টিকে আমরা কর্ম্ম বলিয়া থাকি—অতীতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সহিতও থাকিবে। আমরা অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, সেইজন্য আমরা অতীত অথবা বর্ত্তমান দেখিতে পাই না। সুতরাং যখন কোন বিষয় ঘটিয়া থাকে, তখন আমরা ভাবি যে, উহা হঠাৎ ঘটিল। উহার অস্তিত্ব যে কোথা হইতে আসিল, তাহা

আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ দেখিতে পাই না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে হঠ, দৈব অথবা পুরুষকার, কর্ম্মের বিভিন্ন উপাদানমাত্র, অর্থাৎ উহারা সকলেই কর্ম্মের নিয়মের মধ্যে রহিয়াছে। হঠ, কর্ম্মেরই একটী উপকরণ,— উহা কর্ম্মের নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছে।

সপ্তম প্রস্তাব।

(অদৃষ্টের খণ্ডন)

জীবের স্বাধীনতা কত দূর পর্য্যন্ত আছে, তাহা আমরা দেখিলাম। অদৃষ্টের খণ্ডন হয় কি না, এইবার তাহা দেখা যাউক। অদৃষ্টের মূল কি, —তাহা আমাদের দেখা উচিত। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,—"প্রাক্ পৌরুষাদ্দৈবং নাস্ত্যৎ"—(মুমুক্ষু—৬—১), অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত দৈব নাই। সেই দৈব, দৃষ্ট হয় না বলিয়া, উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়। সুতরাং প্রাক্তন পুরুষকারের নামই অদৃষ্ট। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,—

"দ্বৌ হুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থৌ পরস্পরম্।
য এব বলবাংস্তত্র স এব জয়তি ক্ষণাৎ ॥"

(মুমুক্ষু—৬—১০)

অর্থাৎ, প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকারদ্বয়, মেষদ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর যুদ্ধ করে, তন্মধ্যে যাহার বল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্ট যে, পুরুষকারের দ্বারা খণ্ডনীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

অদৃষ্টে বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এই বিশ্বাসের বলে মনুষ্য—রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা সকলই ভুলিয়া যায়; বিপদে পড়িয়াও হতাশ্বাস হয় না। জীবের স্বাধীনতাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যখন দুঃখে, শোকে, তাপে এই মায়াময় সংসারে জর জর হয়, যখন তাহার নিজের চেষ্টা, নিজের উদ্যম, নিজের যত্ন, নিজের পরিশ্রম, কোনও

প্রকারে ফলদায়ক হইতেছে না দেখে। তখন মনুষ্য, স্বভাবতঃ মনে করে যে, "আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টায় কিছুই হয় না এবং কিছুই হইতে পারে না; আমি অবশ্য আমার অদৃষ্টের দাস। আমার অদৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, আমি সেইরূপে পরিচালিত হইব।" মনুষ্যের এই অদৃষ্ট তাহারই পূর্ব্বকৃত 'গণ্ডি'মাত্র। সে নিজেই তাহার অদৃষ্ট প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে সেই অদৃষ্ট খণ্ডনীয় নহে, তাহা কে বলিল? মনুষ্যের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, "পূর্ব্বকার কর্ম্মফলে যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নাম অদৃষ্ট; সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই।" অদৃষ্টে বিশ্বাস করা এক কথা এবং অদৃষ্ট "অখণ্ডনীয়" বলিয়া বিবেচনা করা অন্য কথা। যাঁহারা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন। অনিয়ম করিলে রোগ হয়,—ইহার নামই কর্ম্মফল; কিন্তু রোগ হইলে যে তাহার প্রতীকার হইবে না, তাহার ঔষধ, তাহার চিকিৎসা, তাহার শুশ্রূষা চলিবে না, এইরূপ কথা বলা বাতুলতামাত্র। মনুষ্যের কর্ম্মফল অদৃষ্ট-রূপে—শুভ অথবা অশুভ, পাপ অথবা পুণ্যরূপে, প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই ফল যে অটল, অচল, অখণ্ডনীয় অথবা অপরিবর্ত্তনীয়, এইরূপ ধারণা আমরা করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কর্ম্মের নিয়মই অটল, অচল, অপরিবর্ত্তনীয়। এইজন্যই আমরা যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ফল, চেষ্টা করিলে পাইতে পারি। একমাত্র আমাদের আত্মাই অদাহ্য, অশোষ্য, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য অথবা অপরিবর্ত্তনীয়। মায়াময় সংসারে যাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জগতে সকল সময় সত্য হয় না। সুতরাং মায়াময় সংসারে অদৃষ্ট "অখণ্ডনীয়" বলিয়া পরিগণিত হইলেও, আধ্যাত্মিক জগতে উহা "অখণ্ডনীয়" নহে। মায়াময় সংসারে জীবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মায়াতীত অবস্থায় যাইতে পারিলেই অদৃষ্টের খণ্ডন হইবে। কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় যাওয়া পুরুষকারসাপেক্ষ। আমাদের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তি মায়াতীত অবস্থায় যাইতে পারে না বলিয়াই অদৃষ্ট "অখণ্ডনীয়" ভাবিয়া থাকে।

জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা মনুষ্য মায়াতীত অবস্থায় গিয়া থাকে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিতে অর্জ্জুনকে উপদেশ

দিয়াছেন। সৎকর্ম্ম, সদাচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা কর্ম্মফল 'খণ্ডন' হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানই হউক, অথবা ভক্তিই হউক, সকলই পুরুষকার-সাপেক্ষ। বেগবতী স্রোতস্বিনী পর্ব্বতরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাভি-মুখে গমন করে; সমুদ্রাভিমুখে গমন করাই তাহার রীতি বা অদৃষ্ট; কিন্তু সেই রীতিকে রোধ করিতে হইলে, অথবা তাহার অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে সেই নদীর সম্মুখে হিমালয়ের ন্যায় সুদৃঢ়, অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে বসাইতে হইবে। পর্ব্বত যদি নদী অপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে নদী প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে নদী পর্ব্বত ভেদ করিয়া যাইবে। সুতরাং পর্ব্বতের উপর নদীর অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। আমাদের অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে ঐরূপ পর্ব্বতের ন্যায় পুরুষকারের প্রয়োজন। এই পুরুষকারকে শাস্ত্রে "অত্যুৎকট" পুরুষকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অত্যুৎকট পুরুষকারের দ্বারা জীবের অদৃষ্ট খণ্ডিত হয়, মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জীব তখন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে।

'প্রাক্তন' অর্থে, পূর্ব্বে অর্থাৎ অতীত জন্মে কৃত। সুতরাং প্রাক্তনকর্ম্ম, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ উভয়বিধ কর্ম্মকেই বুঝাইয়া থাকে। সঞ্চিত কর্ম্মের যে নাশ হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রারব্ধকে নাশ করা যায় কি না? এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। শাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে,—"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ,"—অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে,—অত্যুৎকট কর্ম্মের দ্বারা প্রারব্ধকেও খণ্ডন করা যায়; যেমন নহুষ, নন্দীশ্বর প্রভৃতির উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ বেদান্তদর্শনে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মৈক-রত কোন কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাদি দ্বারাই ক্ষয় হয়, কিন্তু এখন বলা হইল যে, ভোগব্যতিরেকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়; এই বিরোধের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই। কিন্তু সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবের অত্যুৎকট কর্ম্ম ভিন্ন

উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অত্যুৎকট কর্ম্ম ও ঈশ্বরের ইচ্ছা একই কথা। অতএব কোন কোন ব্রহ্মৈকরত ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে। গুরুতর শিলার পতনে যেরূপ চক্রের ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অত্যুৎকট কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য জীবন্মুক্ত পুরুষগণ প্রারব্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। "চক্রভ্রমিবদ্ ধৃতশরীরী" হইয়া তাঁহারা প্রারব্ধ ভোগ করেন অথবা কায়ব্যূহ রচনা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রারব্ধের ক্ষয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কখন অদৃষ্টের অর্থাৎ সঞ্চিত ও প্রারব্ধরূপ প্রাক্তনকর্ম্মের খণ্ডন হইয়া থাকে এবং কখনই বা উহা হয় না। সুতরাং "অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়" এইরূপ ধারণা যে, ভুল—তাহা আমরা অবগত হইলাম।

প্রাক্তন-কর্ম্মসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে আমরা উপরি-উক্ত সত্যের মর্ম্ম আরও স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব।

আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহা কামনা এবং ভাবনার দ্যোতকমাত্র; বাসনা উত্তেজিত করে এবং ভাবনা স্থির (Plan) করে। চিন্তার শক্তিসমূহ ক্রমশঃ একস্থ হইলে উহার প্রাখর্য্য হয় এবং তাহার ফলে কর্ম্ম সংঘটিত হয়; কিন্তু ইহা ভিন্ন আমাদের আরও একটী বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে,—অর্থাৎ উহার উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিনা বাধায় কামনা ও ভাবনা, কার্য্য করিতে পারে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রাচীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; এই প্রাচীর উক্ত চিন্তার প্রসারণকে বাধা দিয়া থাকে এবং ইহার ফলে যদি কোন জীবনে কার্য্য না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রাচীরের পার্শ্বে চিন্তা ও কামনার শক্তিসমূহ একস্থ হইতে থাকিবে। পরজন্মে হয় তো ঐ প্রাচীরের লোপ হইতে পারে, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে পর, পূর্ব্বসংগৃহীত ভাবনা ও কামনার একস্থ শক্তির প্রকাশ হইবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যকেই অবশ্যম্ভাব্য বলা হয়; এই ক্ষেত্রে মনুষ্যের কোন পছন্দ (Choice) থাকে না। এই সকল কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার কর্মসম্বন্ধে এইরূপ ধরা হইয়াছিল যে, ঐ প্রাচীরের বাধা দিবার শক্তির লোপ হইয়াছে,—উহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিণমিত করা হইয়াছে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ উহা আর বাধা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এখন ধরা যাউক যে, একত্র ও সংগৃহীত ভাবনা এবং কাননার শক্তি ঐ প্রাচীরকে ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন হইতে পারে যে, ভবিষ্য জীবনে কার্য্য করিবার সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্মকে অবশ্যম্ভাব্য করিবার জন্য ভাবনা ও কামনা-শক্তি-সমূহ, যথোপযুক্তভাবে সংগৃহীত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে আমরা হয় একটী নূতন ভাবনা ও কামনা-শক্তি, পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির সহিত সংযোগ করিতে পারি অথবা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারি। ঐ কর্ম্মের সংঘটনের জন্য আমরা একটী শক্তি উহার সহিত সংযোগ করিতে পারি, অথবা বিয়োগ করিতে পারি। কার্য্য ও কারণের অনন্ত সূত্রকেই 'কর্ম্ম' আখ্যা প্রদান করা হয় এবং যখন আমরা কোন বিশেষ কার্য্যের কথা বলি, তখন আমরা ঐ অনন্ত সূত্রের একটীকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ সূত্র এতদূর অগ্রসর হয় যে, ঐ কার্য্যটী আমাদের ঠিক্ সম্মুখবর্ত্তী সোপান হয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের অতীত কর্ম্ম বা অদৃষ্টকে পরিবর্ত্তন করিতে পারি। সুতরাং কোন অবশ্যম্ভাব্য কর্ম্মের যথাযথ অবস্থা নির্দ্ধারিত করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। একটী পথের শেষে একটী গর্ত্ত আছে। একটী লোক শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চার করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেছে এবং এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কেবল একটি-মাত্র পদবিক্ষেপ করিলে, সে সেই গর্ত্তে পতিত হইবে। যদি ঐ গর্ত্ত সেই ব্যক্তির দৃশ্যপথে পতিত হয় এবং আর একটীমাত্র পদবিক্ষেপ না করে, তাহা হইলে সে পতিত হইবে না। সুতরাং তাহার দৃশ্যকার্য্যের উপর তাহার কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অতএব আমরা যে কর্ম্মের ফল ভোগ করি, সেই কর্ম্ম আমাদের বাহ্য প্রদেশ হইতে আইসে না এবং আমাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করে না। পূর্ব্ব হইতে আত্মকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পথে, ব্যক্তিগত শক্তিরূপে কর্ম্ম, আমাদিগকে লইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে আমরা স্বয়ং একটী পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই পথে আমাদিগের

কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যক্তিগত শক্তি, আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। এই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"Karma is not something external to us, which acts as a compelling force, but our own individual force which carries us along self-determined lines."—A. B.

অর্থাৎ আমরা পূর্ব্ব হইতেই একটী পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই পথের নাম প্রাক্তন বা অদৃষ্ট। যে শক্তির দ্বারা আমরা ঐ পথে অগ্রসর হইতেছি, সেই শক্তির নামই কর্ম্ম। কিন্তু এই শক্তি আমাদের নিজেরই শক্তি। আমরা ঐ শক্তির সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা; কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তা নহে। আমাদের মানসিক চেষ্টার দ্বারা আমরা আমাদের কর্ম্মফল পরিণমিত করিতে পারি; তাহার ফলে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের ফলও নিয়মিত ও পরিণমিত হয়। ঐরূপ করিবার সামর্থ্য আমাদেরই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের বাহিরে নাই। যতই আমাদের নূতন নূতন ভূয়োদর্শন হইতেছে, ততই আমরা নূতন নতন শক্তি সঞ্চয় করিতেছি। নূতন ভূয়োদর্শনের দ্বারাই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে; প্রত্যেক নূতন ভূয়োদর্শন অনবরত নূতন শক্তি (impulse)-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই সকল ভূয়োদর্শন আমাদের সংবিৎকে পরিণমিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে নূতন নূতন স্রোতস্বিনীসকল কর্ম্মের কারণরূপ তটিনীতে পতিত হইতেছে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম, অবশ্যম্ভাব্য; কিন্তু, সঞ্চিত কর্ম্ম অনবরত নিয়মিত ও পরিণমিত হইতেছে। এই দুই কর্ম্মের নামই অদৃষ্ট। ইহার যে খণ্ডন হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান কোন্ কর্ম্ম অতীতের কর্ম্ম দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে এবং অন্য কোন্ কর্ম্ম আমাদের দ্বারা পরিণমিত ও নিয়মিত হইতেছে।

অদৃষ্টবাদীরা কর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহার দুই একটীর আলোচনা না করিলে, অদৃষ্ট-খণ্ডন আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব না। কাহাকে দুঃখভোগ করিতে দেখিলে, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, 'ঐ ব্যক্তি উহার কর্ম্মফল বা অদৃষ্টভোগ করিতেছে, উহার কর্ম্মে আমা-

দের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কর্ম্মের নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা বাতুলতামাত্র।' কিন্তু কর্ম্মফলসম্বন্ধে এইরূপ ধারণা যে ঠিক্ নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মাধ্যাকর্ষণের শক্তির একটী নিয়ম (Law of gravitation) আছে; তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেক বস্তু, অপর বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের হস্তচ্যুত প্রস্তরখণ্ড যে, পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার কারণ হইতেছে, এই নিয়ম। এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করা যে, বাতুলতা—তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাই বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের দোহাই দিয়া আমরা কোন শিশুর মস্তকে কোন গুরুভার বস্তু পতিত হইতে দেখিয়া—যখন ঐ বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা সরাইয়া দিতে পারি,—চুপ্ করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না বটে, কিন্তু নূতন শক্তিসমূহপ্রয়োগ করিয়া, ঐ নিয়মের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফলকে পরিণমিত করিতে পারি।

কর্ম্মফলসম্বন্ধে ঠিক্ ঐ নিয়ম খাটিয়া থাকে। মনুষ্য, ইহজন্মে এবং অতীতজন্মসমূহে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে মনুষ্যের কর্ম্ম বলা হয়। কোন মুহূর্ত্তে কর্ম্মের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে; কিন্তু মনুষ্য প্রতিমুহূর্ত্তে কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছে; সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তে সে, কর্ম্মের সমবায় (Resultant) পরিবর্ত্তিত করিতেছে। ধরা যাউক যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্য যে, দুঃখভোগ করিতেছে, তাহা তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফল; কিন্তু, সে ব্যক্তি, সেই সময়ে অন্য কর্ম্মও করিতেছে। কর্ম্মের নিয়ম কি আমাদের এমন অনুজ্ঞা করে যে, ঐ ব্যক্তি কেবল মন্দ কর্ম্মই করিবে এবং ভবিষ্যতে দুঃখভোগ করিবে? আর এক কথা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত কর্ম্মের ন্যায় মনুষ্য-জাতির কর্ম্ম আছে। তাহাকে শাস্ত্রে 'মনুর' কর্ম্ম বলে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে, তাহাকে আমরা যদি সাহায্য না করি, তাহা হইলে মনুর কর্ম্মানুসারে মনুর ক্ষতি হইবে এবং মনুর ক্ষতি হইলে, আমাদেরই ক্ষতি হইবে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে—সে, যতই অযোগ্যপাত্র হউক না কেন, তাহাকে ভালবাসা, তাহাকে সাহায্য করা—আমাদের উচিত। আমাদের ভালবাসা, সদিচ্ছা এবং সাহায্য করিবার শক্তি

তাহার জীবনে এক নূতন বল প্রদান করিবে; তাহার ফলে তাহার অতীত অথবা বর্ত্তমান কর্ম্মফলের পরিবর্ত্তন হইবে না; কিন্তু, তাহার ভবিষ্যতের পরিবর্ত্তন হইবে। আমাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আমরা যে, তাহাকে ভালবাসিব, অথবা সাহায্য করিব, তাহা আমাদেরই কর্ম্মফল। কর্ম্মফলে যেমন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তেমনই দুঃখমোচনকারিণী শক্তিও, উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা কর্ম্মের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু, পরের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টাও অতীত কারণের ফল, ইহা কর্ম্মেরই অংশ; এবং ইহার দ্বারা এইরূপ প্রমাণ হইতেছে যে, অতীতে যে মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছে, দুঃখভোগের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিঃশেষিত হইল।

অনেকে হয় তো এইরূপ বলিবেন যে, ধরা যাউক যে, যাহারা অদৃষ্টবশতঃ দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা উচিত; কিন্তু, যাহারা যথার্থ শাস্তি পাইবার উপযুক্ত, তাহাদিগকে সেই যথার্থ শাস্তি হইতে বঞ্চিত করা কি উচিত? ইহার উত্তরে বক্তব্য—মনুষ্য, যে কেবল অদৃষ্টবশে অর্থাৎ অতীতকর্ম্মফলে, সুখদুঃখভোগ করে, তাহা নহে। ইহজন্মের ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলেও সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়; সুতরাং যে সকল অবশ্যম্ভাব্য কর্ম্মফল, তাহারা যে, কেবল অতীত জন্মে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নহে; ইহজন্মেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুঃখভোগ, মনুষ্যের কর্ম্মফল হইলেও, দুইটী কারণে ঐ দুঃখমোচন করা উচিত। প্রথমতঃ—যে, দুঃখমোচন করে, তাহার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ—যাহার দুঃখ মোচিত হয়, তাহার জন্য। যখন মনুষ্য, অপরের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয়, তখন তাহার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু, যদি সে ব্যক্তি, চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রত্যেক চেষ্টা, তাহার হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্পাদন করিবে এবং তাহাকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। ক্রমবিকাশের ভিত্তি হইতে দেখিতে গেলে আমরা বলিব যে, প্রত্যেক বিফলতাকেও সফলতার ভিতর ধর্ত্তব্য। যে কর্ম্মদেবতাগণ, কর্ম্মের নিয়মরক্ষা ও তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের এমন ইচ্ছা নয় যে, যে ব্যক্তি, দুঃখ ভোগ করিতেছে—সে, অনন্তকালই দুঃখভোগ করিবে।

যদি ঐ দুঃখের শেষ থাকে, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে, যখন তুমি দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করিতেছ, তখন তোমাকেই সেই দুঃখের মোচনের জন্য নিমিত্তকারণরূপে কর্ম্মের অধীশ্বরগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বজ্ঞ নহি। সে জন্য আমাদের জানিবার কোনপ্রকার উপায় নাই যে, যাহারা দুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তাহারাই দুঃখমোচনরূপ কার্য্যের নিমিত্তকারণ কি না। যতক্ষণ না দুঃখমোচনের চেষ্টা করা হয় এবং যতক্ষণ না সেই চেষ্টা অকৃতকার্য্য হয়, ততক্ষণ দুঃখের শেষ হইয়াছে কি না, তাহা অবগত হইবার আমাদের কোন উপায় নাই। কিন্তু, এখন জিজ্ঞাস্য যে, কখন সেই দুঃখমোচন সম্ভবপর হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যখন অবস্থাসকল, প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ দুঃখের অবধি হয় এবং যাঁহারা দুঃখের মোচন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই উহার মোচনের যথার্থ নিমিত্তকারণ হইয়া থাকেন, তখনই সাহায্য সম্ভবপর হয়। যদি ঐ দুঃখমোচনকারী, বিফলমনোরথ হয়, তাহা হইলেও দুঃখভোগী পুরুষ—সাহায্য, সন্নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া অনেকটা আনন্দলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, মনুষ্য, যখন দুঃখভোগী পুরুষকে সাহায্য করে, তখন তাহা যথার্থ শান্তি হইতে, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল হইতে কর্ম্মকে বঞ্চিত করা হয় না। আমরা যে কর্ম্ম করি না কেন, আমাদের উদ্দেশ্যের (motive) উপর সকল কর্ম্ম, নির্ভর করিতেছে। যখন মনুষ্য, অপরের দুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য যে, সৎ—তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সৎ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিলে, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অধীশ্বরগণের কর্ম্মনির্ব্বাহক (Agent)-স্বরূপ হওয়া যায়; সুতরাং, ঐ সকল কর্ম্মকে অপর কর্ম্মের বাধা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ, পরের দুঃখমোচনের জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে যে, কোন্‌টী প্রাক্তন কর্ম্মের ফল এবং কোন্‌টী ঐহিক কর্ম্মের ফল,—অর্থাৎ কোন্‌টী অদৃষ্টের ফল এবং কোন্‌টী ঐহিক পুরুষকারের ফল,—তাহা অবগত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। উহা অবগত হইবার উপায় আছে কি? ইহার উত্তরে শাস্ত্র, বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা ঐহিক পুরুষকারের (Free will) ফল।

বাহ্য-অবস্থাসকলের (যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুবিধা) ও আন্তরিক অবস্থাসকলের (যেমন, ক্ষমতাসকল এবং প্রবৃত্তিসকল) সীমার মধ্যে মনুষ্য, তাহার ঐহিক পুরুষকারের (Free will) চালনা করিতে পারে। ক্ষমতাসকল এবং প্রবৃত্তিসকল, মানসিক ব্যাপার। কিন্তু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুবিধাসকল ভূতাত্মকমাত্র। উহারা মনের অন্তর্গত নহে; উহারা বাহ্য-পদার্থ-মাত্র। ঐহিক পুরুষকারের ফলে মনুষ্য, তাহার ক্ষমতাসকল বৃদ্ধি করিতে এবং ভাবনার দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিসকল, দৃঢ় করিতে পারে। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমাদের উপযোগিনী হয় এবং যদি সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, ইহলোকেই ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্য এবং আন্তরিক অবস্থাসকলের যখন সম্মিলন ঘটে, তখন যে কার্য্য, সম্পাদিত হয়—তাহাকে পুরুষকার (Free will) সম্পাদিত কর্ম্ম বলা হয়। ইহা ভিন্ন অপর সকল কর্ম্ম, প্রাক্তন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

অষ্টম প্রস্তাব।

(কর্ম্ম ও জ্যোতিষ)

কর্ম্মফলসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ অবগত হইলাম যে, আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি—সকলই, কর্ম্মের নিয়মের অধীন। আমরা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত আছি, তাহারা সকলেই কর্ম্মের মহান্ নিয়মের অন্তর্গত। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, তাহা মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ম্মফল ব্যক্ত হইয়া—কর্ম্মফল ঘনীভূত হইয়া, কর্ম্মফল মূর্ত্তিমান্ হইয়া—এই বিশ্বের আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের অতীত কর্ম্মের ফলে আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণু, গঠিত হইয়াছে—কেবলমাত্র তাহা নহে। আমাদের মনের বৃত্তি, আমাদের জীবনের অভ্যাস, অনুভব, চিন্তাপ্রভৃতি সকলই, আমাদের অতীত

জন্মে যেরূপ গঠন করিয়াছিলাম, ইহজন্মে সেইরূপ পাইয়াছি। এমন কি, আমাদের স্থূল শরীরের উপর যে সকল চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা আমাদের অতীত কর্ম্ম, ব্যক্তিত করিতেছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এমন কতকগুলি নিয়ম লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা ঐ সকল শারীরিক-চিহ্ন-দৃষ্টে অতীত কর্ম্ম-সকল বুঝিতে পারা যায়। ইহাকে 'সামুদ্রিক' বলে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারে অর্থাৎ গ্রহ, রাশি এবং নক্ষত্রের সাহায্যে জ্যোতিষের দ্বারা অতীত কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। জ্যোতিষ, আমাদের অতীত কর্ম্মের নির্দ্দেশক-মাত্র। গ্রহ, রাশি, অথবা নক্ষত্র, আমাদের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করে না; আমরা অতীত-জন্ম-সমূহে কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, এবং তাহার ফলে আমরা ইহজন্মে কিরূপ ভোগ করিতেছি, কেবলমাত্র সেই বিষয়ই উহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। গর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া চ্যবন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ ঋষি, জ্যোতিষের সাহায্যে মনুষ্যের কর্ম্মফল বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত আলোচনা, ভৃগুমুনি-লিখিত 'ভৃগুসংহিতা'-নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। *

১। আমাদের স্থূল শরীরের প্রত্যেক পরমাণু, আমাদের প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কামনা, আমাদের জীবন এবং এমন কি, আমাদের অধি-কৃত প্রত্যেক বস্তু, আমাদেরই কর্ম্মফলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা অতীত জন্মে যে সকল 'কারণ' সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার ফলে আমরা ঐ সকল পাইয়াছি এবং পাইতেছি।

ভৃগু ঋষি বলিয়াছেন যে, অতীতের কর্ম্মের ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি বা স্বভাব গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কর্ম্মের ফলে আমরা বিশিষ্ট গ্রহগণের প্রভাবের মধ্যে আসিয়াছি। গ্রহগণ, মনুষ্যের স্বভাবের দ্যোতক-মাত্র। অতীতের কর্ম্মফলে আমরা অধুনা যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, গ্রহগণ সেই অতীত কর্ম্মের নিদর্শক-মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই গ্রহগণকে আমাদের অদৃষ্টের বা ভাগ্যের পরিচালক বলিয়া থাকেন। আমরাই আমা-দের অদৃষ্টের কর্ত্তা—গ্রহগণ আমাদের অদৃষ্টের পরিচায়কমাত্র।

* দুঃখের বিষয়—"ভৃগুসংহিতা"-নামক পুঁথিখানি অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দুই এক জন অর্থপিশাচের হস্তে পড়িয়া এই পুস্তক, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

২। সাতটী গ্রহের মধ্যে পাঁচটী গ্রহই, পাঞ্চভৌতিক (Physical) মনুষ্যের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদি হইতে আমরা অবগত হই যে, তত্ত্ব পাঁচপ্রকার; ইহাদিগকে স্থূল তত্ত্ব বলা হয়। ইহা ভিন্ন আর দুইটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। তাহাদের সহিত পাঞ্চভৌতিক (Physical) মনুষ্য, অর্থাৎ স্থূল-মানব-শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেই প্রকার সাতটী গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটীর সহিত মনুষ্যের স্থূল শরীর, সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রকাশমান বিশ্ব, পাঁচটী তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটী সৃষ্টির এক এক অংশমাত্র। সুতরাং সমষ্টিভাবে এই পঞ্চতত্ত্বগুলিকে সৃষ্টির পঞ্চ অংশের দেবতা বা পরিচালক বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাঁচটী তত্ত্বের পাঁচটী গ্রহের সহিত মিল আছে। সুতরাং এই পাঁচটী গ্রহকে বিশ্বের পাঁচটী বিভাগের বা অংশের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

সাতটী গ্রহের মধ্যে বুধ গ্রহ, পৃথিবীতত্ত্বের সহিত—শুক্র, জলতত্ত্বের সহিত—মঙ্গল, তেজস্তত্ত্বের সহিত—শনি, বায়ুতত্ত্বের সহিত—এবং বৃহস্পতি, আকাশতত্ত্বের সহিত—সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ভৃগু বলিয়াছেন যে, যদি কোন বিশিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা অথবা ঐ তত্ত্বের সম্বন্ধে কেহ কোন কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ঐ তত্ত্বের অধীশ্বরের সহিত সে ব্যক্তি, সম্বন্ধ স্থাপন করিবে,—অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ঐ তত্ত্বের অধীশ্বর-গ্রহের প্রভাবের ভিতর আসিবে। ঐ কর্ম্ম অথবা ঐ কর্ম্মের ফল, সৎ হউক অথবা অসৎ হউক, তাহাতে উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে আসিয়াযায় না; অর্থাৎ, কোন বিশিষ্ট তত্ত্বের সাহায্যে কোন ব্যক্তির সৎ অথবা অসৎ—উভয়প্রকার কর্ম্ম করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যেমন এক ব্যক্তি অগ্নির সাহায্যে অপর ব্যক্তির গৃহাদি দাহ করিয়া অনিষ্ট করিতে পারে; অথবা আলোকের সাহায্যে অপর ব্যক্তির জীবনরক্ষা করিতে পারে। এই প্রকার কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি তেজঃ-সংশ্লিষ্ট মঙ্গলের প্রভাবের অধীন হইয়া থাকে। যদি সে ব্যক্তি ঐ প্রকার মন্দ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে, মঙ্গলের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া সে ব্যক্তি মন্দফল ভোগ করিবে; কিন্তু যদি সৎ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া শুভফল ভোগ করিবে।

কর্ম্মের নিয়ম, ন্যায়পথগামী বলিয়া এক ব্যক্তি এক তত্ত্বের দ্বারা কার্য্য করিয়া অপর তত্ত্বের প্রভাবে ফলভোগ করে না। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি বিষাক্ত দ্রব্যের সংযোগে বায়ু বিষাক্ত করিয়া বায়ু-সঞ্চারী শত সহস্র অণু-প্রাণীকে হত্যা করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি যখন ঐ অসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, তখন বায়ুর অধীশ্বর শনিগ্রহের দ্বারাই ফল ভোগ করিবে। অর্থাৎ শনি তাহার অতীত কর্ম্মের ফল সূচনা করিবে এবং সে ব্যক্তি বায়ুসংক্রান্ত কোন পীড়া, যেমন ফুস্ফুসের পীড়া প্রভৃতি, ভোগ করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রায় সকলপ্রকার কর্ম্মের ফল, বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। যেমন, যদি অগ্নির সাহায্যে শুভ কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য, পরজন্মে শুভ মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সুন্দর কান্তি, পরোপকারের সামর্থ্য এবং দৃঢ় চিত্ত লাভ করিবে।

আমরা পূর্ব্বে যে 'শুভ' অথবা 'অশুভ' মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে; কেবলমাত্র মঙ্গলের সম্বন্ধে শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের পরিচায়কমাত্র। অন্যান্যগ্রহসম্বন্ধে ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মনুষ্য কর্ত্তৃ-রূপে কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং পরজন্মে সেই কর্ম্মের পুত্ররূপে ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে প্রকার উপায়ে, যাহার সাহায্যে এবং যে সময়ে সে কার্য্য করিয়া থাকে, পরজন্মে প্রায় ঠিক্ সেই প্রকার উপায়ে, সাহায্যে এবং সময়ে তাহার ফল ভোগ করিবে।

৩। কর্ম্মের নিয়ম এই যে,—প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা, কর্ম্ম, কারণ ও ক্রিয়া বা ফল থাকিবে। যেমন মনুষ্য যদি দন্তের দ্বারা কাহাকে দংশন করে, তাহা হইলে দন্তকে কর্ত্তা, দংশনকে কর্ম্ম, মনুষ্য যাহার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া দংশন করে, তাহা কারণ এবং কষ্টভোগ, ক্ষত অথবা চিহ্নকে ক্রিয়া বলে।

ইহা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, যদি কোন বিশিষ্ট অঙ্গের দ্বারা কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্য জন্মে সেই বিশিষ্ট অঙ্গ একই প্রকার কারণ দ্বারা শুভ অথবা অশুভ প্রকারে নিয়মিত (affected) হইয়া একই

প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, কারণ এবং ক্রিয়া, কর্ম্মের নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অতীত কর্ম্মের ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৪। বৃহৎসম্বন্ধে যে নিয়ম খাটিবে, ক্ষুদ্রসম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাটিয়া থাকে। শাস্ত্রে বিরাট্ বা কাল পুরুষের অঙ্গের বারটী ভাগ বা প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা হয় এবং সেই অনুসারে আমাদের ক্ষুদ্র শরীরেও বারটী প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা হইয়াছে। জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে রাশিচক্রেরও বারটী ভাগ বা রাশি কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট অথবা ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গের সহিত প্রত্যেক রাশির মিল আছে; সুতরাং প্রকাশমান বিশ্বের বারটী অংশ, মনুষ্যশরীরের বারটী অঙ্গ এবং রাশিচক্রেরও বারটী রাশি আছে। যে যে অঙ্গের সহিত যে যে রাশির মিল আছে, তাহা উল্লিখিত হইল।

অঙ্গ				রাশি
১। মস্তক ও মুখ	...	...	...	মেষ
২। কণ্ঠ ও গ্রীবা	...	...	...	বৃষ
৩। বাহু	...	...	...	মিথুন
৪। হৃদয় ও জঠর	...	...	...	কর্কট
৫। পৃষ্ঠদেশ	...	...	...	সিংহ
৬। কটি ও উদর	...	...	...	কন্যা
৭। বস্তি	...	...	...	তুলা
৮। গুহ্য	...	...	...	বৃশ্চিক
৯। উরু	...	...	...	ধনু
১০। জানু	...	...	...	মকর
১২। জঙ্ঘা	...	...	...	কুম্ভ
১২। পদ-দ্বয়	...	...	...	মীন

উক্ত বারটী রাশির দ্বারা কেবল যে, বিশ্বের কর্ম্ম সূচিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। কর্ম্মের ফল, মনুষ্যের কোন অঙ্গের উপর ফলিবে, তাহাও উহাদের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কোন্ বিশিষ্ট অঙ্গে উক্ত ফল ফলিবে, তাহা স্থির করিবার জন্য ঋষিগণ, ঐ এক এক রাশিকে ৩০ ✕ ৬০ ভাগে

এবং সমুদয় চক্রকে ১২ × ৩০ × ৬০ = ২১৬০০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ষড়াংশ বিভাগের দ্বারা এই সকল বিষয় গণিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের জন্ম সময়ে রাশিচক্রে গ্রহগণ যেরূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহার সাহায্যে প্রথমতঃ মনুষ্যের অতীত কর্ম্ম বুঝা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের শরীরের কোন্ অংশ, শুভ অথবা অশুভরূপে নিয়মিত হইতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায়।

৫। নিম্ন লিখিত উপায়ে আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয় অবগত হইয়াথাকি :—

প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে সংক্রমণ করে বলিয়া, মনুষ্যশরীরে বিশিষ্ট অংশের কর্ম্মের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। গ্রহগুলি কর্ম্মের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন্ তত্ত্বের সাহায্যে কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া যায়। এবং শরীরের কোন অংশে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে তাহা রাশি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং গ্রহ এবং রাশির সাহায্যে আমরা সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারি। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মের নিয়ম অনুসারে আহত ব্যক্তির ন্যায় সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ জন্মে কষ্ট ভোগ করিবে। ভবিষ্যৎ জন্মে যদি কোন ব্যক্তি আঘাত করিয়া তাহার মস্তক ক্ষত করে, তাহা হইলে সে অতীতের কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে। জন্ম-পত্রিকার সাহায্যে এই ফল বলা যায়; এইরূপ স্থলে মঙ্গল (রক্ত), মেষ রাশিতে থাকিবে—মেষ রাশি মনুষ্যের মস্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মনুষ্য যদি আহত ব্যক্তিকে তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আঘাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে জন্মে সেই ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিবে, সেই জন্মে ঠিক পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মঙ্গল মেষ রাশিতে সঞ্চার করিবে। মনুষ্য এই প্রকারে জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার কর্ম্মফল অবগত হইয়া থাকে।

৬। মনুষ্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। গ্রহগণও এই তিন গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা :—

(ক) সত্ত্ব গুণের পরিচায়ক :—সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি।
(খ) রজঃ „ „ বুধ ও শুক্র।
(গ) তমঃ „ „ মঙ্গল ও শনি।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন কর্ম্ম কেবল মাত্র একটী গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না, আর দুইটী গুণ উহার সহিত সংযুক্ত থাকে। যখন আমরা কোন কর্ম্মকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলি, তখন উহাতে সত্ত্ব গুণের আধিক্য থাকে, এবং আর দুইটী গুণ অতি অল্প ভাগে মিশ্রিত থাকে। রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে উহাই বক্তব্য। গ্রহগুলি কেন উক্ত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বদর্শীরা অবগত আছেন।

৭। পূর্ব্বোক্ত বারটী রাশি ভিন্ন মনুষ্যের জন্ম কুণ্ডলীতে বারটী গৃহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই বারটী গৃহ, মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয় সূচনা করিয়া থাকে। যখন কোন গৃহে বিশিষ্ট প্রকার গ্রহ থাকে, তখন সেই গৃহের বিষয়োপযোগী অতীত জন্মের কর্ম্ম সূচিত হয়। যে গৃহ মনুষ্যের যে বিষয় সূচনা করে তাহা লিখিত হইল :—

গৃহ	ভাবের সূচনা করে।
প্রথম	তনু, আকৃতি, রূপ
দ্বিতীয়	ধন, সম্পত্তি
তৃতীয়	ভ্রাতা, ভগ্নী, কুটুম্ব
চতুর্থ	বিশ্রাম, সুখ, আলয়, বন্ধু
পঞ্চম	সন্তান, বিদ্যা, বুদ্ধি
ষষ্ঠ	রিপু, দাস, দাসী
সপ্তম	জায়া
অষ্টম	নিধন
নবম	ধর্ম্ম, দীক্ষা, গুরু
দশম	কর্ম্ম, ব্যবসায়, সম্মান, যশঃ
একাদশ	আয়
দ্বাদশ	ব্যয়

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ গৃহ দ্বাদশ ভাবের সূচনা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রহ প্রত্যেক রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সময়ের বিভাগকে রাশি বলে; ইহার অপর নাম কালাংশ। বিরাট্ পুরুষের অংশকে গৃহ বলে। এই দুয়ের সমবায়ে কালপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন। রাশির

সংখ্যা দ্বাদশ এবং গৃহের সংখ্যা দ্বাদশ হওয়াতে এবং প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চার করে বলিয়া কালপুরুষসম্বন্ধে প্রত্যেক গ্রহ ১২×১২=১৪৪ বার সঞ্চার বা চার করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রহের সংখ্যা ৯ বলিয়া, উহারা সকলে একত্রে ১,২৮৯,৯৪৫,০৮৮ বার রাশিচক্রে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিলে কোন একটী গ্রহ ১৪৪ প্রকার কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং নয়টী গ্রহ ১,২৮৯,৯৪৫,০৮৮ প্রকার কর্ম্মের—অর্থাৎ যত প্রকার কর্ম্ম সম্ভব তত প্রকার কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। সময় এবং স্থান সম্বন্ধে ধরিতে গেলে প্রত্যেক গ্রহের অধীনে ১৪৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক কর্ম্ম একটী জীবনে হইতে পারে না। এবং সমুদয় গ্রহের অধীনে ১,২৮৯,৯৪৫,০৮৮ সংখ্যক কর্ম্মের অধিক কর্ম্ম হইতে পারে না। এই প্রকার কর্ম্ম বৈচিত্র্য হয় বলিয়া মনুষ্য বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মনুষ্য যতদিন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে ততদিন ৮৪ লক্ষের অধিক কর্ম্ম করিতে হয় না। ইহার ভিতর আবার অনেক কর্ম্মের ফল মনুষ্য দেবলোকে ভোগ করিয়া থাকে।

৮। ভৃগু মুনি মনুষ্যের কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:— (ক) স্বাধীন, (খ) পরাধীন এবং (গ) পরস্পর মুখাপেক্ষী।

(ক) অপরের সংস্রব ব্যতিরেকে, কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং যে কর্ম্মের ফলভোগ করেন, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলভোগ কেবল কর্ম্মকর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকে তাহাকে স্বাধীন কর্ম্ম বলে; যেমন দরিদ্রকে দান করা। যে বৎসর বয়সে, মাসে, দিনে কিংবা ঘণ্টায় কর্ম্মকর্ত্তা দানরূপ কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভবিষ্যৎ কোন জন্মে ঠিক সেই বৎসর বয়সে, মাসে, দিনে, কিংবা ঘণ্টায় ভোগ করিবে।

(খ) যে কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য,—প্রথমটীর ন্যায় স্বাধীনভাবে নহে,— কর্ম্মকর্ত্তা অপরের আশ্রয় লয়, তাহাকে পরাধীন কর্ম্ম বলে। যেমন যদি কোন বিংশতি বৎসরের যুবা একটী পাঁচ বৎসরের বালককে হত্যা করে, তাহা হইলে ঐ যুবা ভবিষ্যৎ জন্মে কুড়ি বৎসরে তাহার ফল ভোগ করিবে না, —পাঁচ বৎসর বয়সে ঐ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। এ ক্ষেত্রে কর্ম্মের ফল

পঞ্চবর্ষীয় বালকের "প্রতিহিংসার" উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই হেতু ইহাকে পরাধীন কর্ম্ম বলে।

যদি কোন ষোড়শবর্ষীয় বালক একটী অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের কোন ক্ষতি করে, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তা ভবিষ্যৎ জন্মে ষোড়শ বর্ষ বয়সে উহার ফল ভোগ করিবে না,—ঐ হত ব্যক্তির বয়সে অর্থাৎ অশীতি বৎসর বয়সে ঐ মন্দ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। হত ব্যক্তি যে বয়সে হত হইয়াছিল, ঐ যুবা ভবিষ্যৎ জন্মে তাহার কুকর্ম্মের ফল ভোগের জন্য ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে; এবং সেই বৃদ্ধ যে স্থানে, যে সময়ে, যে উপায়ে এবং যে বস্তুর সাহায্যে, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ঐ যুবা খুব সম্ভবতঃ সেই একই স্থানে, একই সময়ে, একই উপায়ে এবং একই বস্তুর সাহায্যে ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(গ) যে কর্ম্মের ফলভোগ পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে, তাহাকে পরস্পর-মুখাপেক্ষী কর্ম্ম বলে। যেমন, যদি ভালমন্দ বিচারের শক্তি পাইবার পূর্ব্বে, কোন বালক তাহার পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দান করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মকে পরস্পরমুখাপেক্ষী কর্ম্ম বলিবে। কারণ, ধরা যাউক যে বালকের বয়স তখন পাঁচ বৎসর ছিল, তাহা হইলে তাহার পিতা ভবিষৎ জন্মে সেই বালকের যখন পাঁচ বৎসর বয়স হইবে তখন এবং সেই বালকেরই সাহায্যে শুভফল পাইবে এবং বালকের পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব অথবা আত্মীয় স্বজনরূপে সেই ফল ভোগ করিবে। অনেকেই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের দুই একটী সন্তান এমন ভাগ্যবান্ হয় যে তাহাদের জন্মমাত্রেরই তাহাদের পিতার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। ইহা আর কিছুই নহে পূর্ব্বকার পরস্পর-মুখাপেক্ষী সৎ কর্ম্মের ফল।

৯। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধীন কর্ম্ম কর্ত্তার সহিত, পরাধীন কর্ম্ম ফলের সহিত এবং পরস্পরমুখাপেক্ষী কর্ম্ম কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

১০। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাশিচক্র বার ভাগে বিভক্ত এবং মনুষ্যের জন্ম-কুণ্ডলীও বার ভাগে বিভক্ত। ঐ রাশি চক্রের বার ভাগের যে ভাগ জন্মকালীন উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন বলে। ঋষিগণ লগ্ন, লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে 'কেন্দ্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও

একাদশ স্থানকে 'পনফর' বলিয়াছেন। এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ স্থানকে 'অপোক্লিম' বলিয়া থাকেন। গ্রহগণ কেন্দ্রস্থান সমূহে প্রবল বলের, পনফরে মধ্য বলের এবং অপোক্লিমে হীনবলের সূচনা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে প্রথমটী স্বাধীন কর্ম্মের,দ্বিতীয়টী পরাধীন কর্ম্মের এবং তৃতীয়টী পরস্পরমুখাপেক্ষী কর্ম্মের পরিচায়ক।

যখন কোন গ্রহ কুণ্ডলীর কোন স্থানে থাকে, তখন যে উহা কেবল মাত্র সদসৎ কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করে তাহা নহে, উহা অতীত জীবনের স্বাধীন, পরাধীন ও পরস্পরমুখাপেক্ষী কর্ম্মেরও পরিচায়ক হইবে।

যেমন যদি শুক্র, লগ্নে থাকে তাহা হইলে যে কেবল সৎকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিবে তাহা নহে উহা স্বাধীন কর্ম্মের নিদর্শন প্রদান করিবে; উহা দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে পরাধীন কর্ম্ম এবং তৃতীয় স্থানে থাকিলে পরস্পর-মুখাপেক্ষা কর্ম্মের সূচনা করিবে। ঐ প্রকার যদি শনি অথবা মঙ্গল থাকে তাহা হইলে উহারা অশুভ কর্ম্মের পরিচয় উক্ত প্রকারে প্রদান করিবে।

শাস্ত্রে কর্ম্মফলের নিয়ম নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা :—

"যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ
যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভাত্মকর্ম্ম।
তস্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাদুপৈতি।"—হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, যে কারণে, যে উপায়ে, যে স্থানে, যে প্রকারে, যে সময়ে, যে লোক যত শুভাশুভ কার্য্য করে, সেই কারণে, সেই উপায়ে, সেই স্থানে, সেই প্রকারে, সেই সময়ে, সেই ব্যক্তি তত শুভাশুভ ফল, বিধাতৃবশাৎ ভোগ করিয়া থাকে।

ইহজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ যে জন্মান্তরে হয়, তাহাও এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—"স্বকর্ম্ম সন্তান বিচেষ্টিতানি কালান্তরাবৃত্তি শুভাশুভানি।"

যে মহান্ নিয়ম কর্ম্ম ও কারণকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে অবগত হইয়া থাকি।

নবম প্রস্তাব।

(কর্ম্মত্যাগ—কর্ম্মযোগ)

কর্ম্মচক্রের বিবর্ত্তনে মনুষ্য যত পেষিত হয় ততই তাহার স্বাধীনতা উপভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে,—সুখের আশার অগ্রসর হইতে গিয়া মনুষ্য যত দুঃখ পায়, ততই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মের গতি অলঙ্ঘ্য, মনুষ্য যতই কর্ম্ম করিতে থাকে ততই কর্ম্মচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া জন্মমরাব্যাধিদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তখন মনুষ্য হতাশ হইয়া বলিয়া থাকে যে কর্ম্মচক্রের বাহিরে গিয়া যথার্থ স্বাধীনতা বা সুখ উপভোগ করিবার কি তবে উপায় নাই? কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট উপদেশ দিয়া কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই পথের নাম কর্ম্মযোগ। বহুকাল অতীত হইল কুরুক্ষেত্রের 'মহাযুদ্ধে' অর্জ্জুনের মনে যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য শাস্ত্রভাণ্ডার মন্থিত করিয়া এই যোগ পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। যিনি যে প্রকার ভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন, তিনি সেই ভূমি হইতে এই যোগ অভ্যাস করিতে পারেন। অর্জ্জুন রাজপুত্র ছিলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহাকে এই সংসারে থাকিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিতে হইয়াছিল এবং বাহ্য শক্তি সমূহের সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল। সেই অর্জ্জুনকে কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভগবান্ যে অনন্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে নিমগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এক মাত্র পন্থা।

কর্ম্মযোগের অর্থ হইতেছে যে, এমন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইয়া যায়—এমন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহার ফলে এই সংযোগ উৎপন্ন হয়। আমারা অবগত আছি যে আমাদের কার্য্যকারিতাশক্তিসমূহই (activities) আমাদিগকে খণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া থাকে; আমাদের কার্য্যসকলই আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া থাকে; আমরা

এই পরিবর্ত্তনশীল এবং বিভিন্ন কার্য্যকারিতাশক্তির দ্বারা পরস্পরে আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকি। সুতরাং যে বিষয়ের দ্বারা আমরা বিভক্ত হইতেছি, যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পৃথক্ হইতেছি, সেই কর্ম্মরূপ বিষয়ের দ্বারাই আমাদের যোগ বা সংযোগের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে,—ইহা শুনিতে আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের অসীম জ্ঞান এই আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়াছে। কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তাঁহারা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা দেখা যাউক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেসু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥"

(গীতা-১৮-৪০)

অর্থাৎ, কোন প্রাণীই পৃথিবীতে, মনুষ্যাদি লোকে অথবা স্বর্গে দেবলোকে, এই প্রকৃতিসম্ভূত সত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নহে। সকলেই গুণানুসারে কার্য্য করিতেছে। প্রকৃতির তিন প্রকার শক্তির নামই গুণ। এই গুণের কার্য্য সকল সময়ই হইয়া থাকে এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব, গুণের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। শরীরোপাধিক জীব নিজেকে গুণের অধীনে মনে করিয়া গুণের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে। গুণ সকল যখন কার্য্য করে তখন জীব নিজে কার্য্য করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকে। গুণ সকল যখন ফল প্রসব করিয়া থাকে তখন সে নিজে ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকে। গুণ সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, তাহাদের মোহে অন্ধ হইয়া, জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়, স্রোতোমুখে পতিত এবং বায়ূ তাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জীব নিজেকে যথেচ্ছঘূর্ণ্যমান দেখিয়া থাকে। জীবনে সে কেবল গুণেরই কার্য্য দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাহার যোগ সম্ভব নহে। তাহাকে প্রথমতঃ গুণজ মোহ ভাঙ্গিতে হইবে, গুণের কার্য্য সকল বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহার নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং গুণের কার্য্য সকলকে নিজের বশে আনাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান।

কিন্তু ইহা সহজ কার্য্য নহে। একজন শিশু কখন যুবার কার্য্য করিতে পারে না। সেইরূপ মনুষ্য একেবারে উহাদিগকে নিজের বশ্যতাপন্ন করিতে পারে না। সেইরূপ করা উচিত নহে, কারণ উহা বিপজ্জনক। উহাদিগকে বশে আনিতে হইলে মনুষ্যদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ তমোগুণের কার্য্য আলোচনা করা যাউক। তমোগুণকে অন্ধকার,আলস্য, জড়ভাবাপন্ন প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হইতে পারে? কর্ম্মবন্ধন ইহার দ্বারা কি প্রকারে ছিন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, এই গুণের দ্বারা কর্ম্মযোগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ইহাকে একটী বিরুদ্ধ শক্তিরস্বরূপে লইয়া, ইহার বিপক্ষে আমাদিগের যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার ফলে আমাদের সামর্থ্য জন্মিবে, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং নিজেকে বশে আনিতে পারা যাইবে। মনুষ্য তখন আলস্য, অবহেলা প্রভৃতি ভাব বর্জ্জন করিতে শিখিবে।

যদি আমরা রজোগুণের আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইহার প্রভাবে মনুষ্য কার্য্যকারিতা শক্তি পাইয়াছে। ইহার প্রভাবে মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে, এবং আত্মসুখরূপ ব্যাপার লইয়া উন্মত্ত রহিয়াছে। এই গুণের দ্বারা কর্ম্মযোগের কি উপকার হইতে পারে? কর্ম্মযোগ আমাদিগকে এমন নির্দ্দেশ করে না যে, কার্য্যকারিতা শক্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, বরঞ্চ এই কার্য্যকারিতা শক্তির দ্বারা আত্মসুখোপভোগ হইতে বিরত হইয়া, যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায়, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা সুখোপভোগের নিমিত্ত করিয়া থাকে—অর্থ চায় তাহার নিজের সুখের জন্য, বল চায় আধিপত্য করিবার জন্য। কিন্তু কর্ম্মযোগে তাহাকে এমন শিক্ষা করিতে হইবে যে আত্মসুখের পরিবর্ত্তে যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায় তাহার চেষ্টা করা। তাহা হইলে সে যে সকল কর্ম্ম করিবে, তাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া করিবে।

এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মনুষ্য কর্ম্মযোগে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রথমে সে নিজের সুখের জন্য করিতেছিল, পরে সে তাহার নিজের আত্মীয়দের জন্য করিবে, কর্ম্মযোগে যত অগ্রসর হইবে

তত স্বজাতির, নিজের দেশের জন্য এবং অবশেষে পৃথিবীর জন্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিবে।

কর্ম্মযোগে অগ্রসর হইয়া কর্ম্মকে নিজের কর্ত্তব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনুষ্য যে পৃথিবীতে বাস করিতেছে, সেই পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর নিকট সে ঋণী। যাহাতে তাহাদের ঋণ শোধ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার নামই কর্ত্তব্য চেষ্টা।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, আমরা অদৃশ্য জগতের এবং দেবরাজত্বের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং তাহাদিগের নিকট ঋণী; আমাদিগকে সেই ঋণ শোধ করিতে হইবে। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" (গীতা-৩-১১।)

অর্থাৎ তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করিবে এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। এই ঋণ শোধের নাম দেবযজ্ঞ।

আমরা যে সকল বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার জন্য আমরা পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণের নিকট ঋণী; সেই ঋণ ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। আমরা পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা করিব এবং যাহা শিখিয়াছি, তাহা অপরকে শিখাইব এবং তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যালোচনা পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইবে এবং আমাদেরও পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণের নিকট ঋণ শোধ হইবে।

পিতৃপুরুষগণের নিকট আমরা ঋণী। তাঁহাদের জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং তর্পণাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করিয়া, সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

মনুষ্য, এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির নিকট অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্য সে উহাদের নিকট ঋণী। সেই ঋণ নৃযজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে। অন্ততঃ একটী বুভুক্ষিত মনুষ্যকে প্রতিদিন অতিথিসেবা

ও অন্নাদি দ্বারা সন্তোষ করা উচিত। তাহার ফল যে কেবল একটি মনুষ্য উপভোগ করে তাহা নহে, সকল মনুষ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। একটী মনুষ্যকে অন্নপ্রদান করিলে, তদধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে এবং সুতরাং সমুদয় মনুষ্যজাতিকে অন্ন প্রদান করা হয়।

মনুষ্যের আরও একটী ঋণ আছে। সমুদয় ভূতরাজন্যের নিকট সে ঋণী, কারণ উহার নিকট হইতে মনুষ্য অনেক বিষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। ভূতযজ্ঞের দ্বারা সেই ঋণ শোধ করিতে হইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ দুই একটি প্রাণীকে আহার প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে, সমুদয় ভূত সন্তুষ্ট হইবে।

কর্ম্মযোগ শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের সুখের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধে সে কার্য্য করিতে শিখিবে। দ্বিতীয়তঃ দৈনিক জীবনে তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, সেগুলি পালন করা উচিত। মনুষ্য যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে বিশিষ্ট পরিবারে, বিশিষ্ট বংশে এবং বিশিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরিবার, তাহার বংশ এবং তাহার জাতির উপর তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম। কর্ম্মযোগে অগ্রসর হইতে হইলে সেই ধর্ম্ম তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।"

কর্ত্তব্য বোধে নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় ভূমি। ফলের আশা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের তৃতীয় ভূমি। ইহার দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। প্রথমে আমরা শিক্ষা করিয়াছি যে কর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য বোধে করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" (গীতা—৩—৯।)

যজ্ঞ (Sacrifice) ভিন্ন সকল কর্ম্মই লোকের বন্ধনস্বরূপ। কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিলেই কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদিগকে জড়িত হইতে হইবে।

সেই বন্ধন হইতে যদি মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে যে আমাদিগকে কতকগুলি কর্ম্ম বাদ দিতে হইবে, তাহা নহে। সকল কর্ম্মকে যজ্ঞের স্বরূপ দেখিবে, অর্থাৎ তাহাদের ফল কামনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, ভগবা ব বলিয়াছেন যে,—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥" (গীতা—৪—২৩)

অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইলে, জ্ঞানে চিত্ত অবস্থিত করিলে এবং যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বিলীন হয়।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে,—"হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সম্যক্‌দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মাস্বরূপ যে আমি, আমাতে আপনাকে অভেদরূপে দেখিতে পাইবে।" তখন কর্ম্মযোগ শেষ হইবে, কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এবং আত্মা পরমাত্মার মিলন হইবে।

অনেকের মনে এইরূপ ভুল ধারণা হইয়া থাকে যে, কর্ম্ম করিলেই যদি বন্ধন হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম না করাই ভাল। ইহার উত্তরে কর্ম্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে কয়েকটী যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। হে পার্থ! তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মে অনুষ্ঠান অনেক শ্রেষ্ঠ। বিনা কর্ম্মে তোমার দেহধারণও অসম্ভব হইবে। যাহারা সকল কর্ম্ম করে, তাহারাই কর্ম্মজ্ঞানে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে।

তুমি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর। যে ব্যক্তি বাক্য-পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণকরতঃ অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়।

২। হে অর্জ্জুন! প্রাণিহিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমাদের বৃষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদের উচিত যে তোমরা দেবপ্রীত্যর্থে কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর (অর্থাৎ নিজের জন্ম কর্ম্ম করিও না)।

৩। সংসারচক্রের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক পরমাণু লইয়া সংসারচক্র উৎপন্ন হইয়াছে। আলস্যের দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে সেই গতির বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নহে।

৪। যিনি চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, যাঁহার আত্মাতেই আনন্দ, যাঁহার আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার করণীয় কার্য্য নাই। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই কার্য্য করিতে বাধ্য।

৫। জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ কার্য্যদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যদি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোকরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ "আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে,"—এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। পৃথিবীতে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; আমার করণীয় কার্য্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ, যদি আমি কার্য্যে অবহেলা করি, তাহা হইলে অন্য সকলেও আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্যে অবহেলা করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ প্রজাসমূহ বিনষ্ট হইবে, এবং আমিই ঐ বিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইব। অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কার্য্য করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে রজোগুণের কার্য্যদ্বারা কিরূপে কর্ম্ম-যোগে অগ্রসর হইয়া সত্ত্বগুণের কার্য্যদ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছেদন করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম। জীব কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে

মুক্ত হইয়া অনন্ত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তখন জীবের কর্ম্মও থাকে না, জন্মও থাকে না, তখন জীব অনন্ত, অসীম, শান্তাকাশবৎ হইয়া থাকে।

দশম প্রস্তাব।

(সার সত্যের আলোচনা ও উপসংহার)

আমরা কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে সকল সার সত্যে উপনীত হইয়াছি, তাহ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল এবং যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল :—

(১) কর্ম্ম করিবার অথবা কর্ম্মফল ভোগ করিবার কোন জীব না থাকিলে কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা। কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না এবং ভোগকারী জীব না থাকিলে ফল কেমন করিয়া ফলিবে? সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে—

"সতিমূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (যোগসূত্র—সাধন—১৩।)

অর্থাৎ, অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলে অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার ক্লেশ যদি কর্ম্মের মূল হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম বা ফলে জন্ম, আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হইবে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে—

"সীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম্ম চেদ্ভুবি।
তথা হেতা ন বর্দ্ধেরন্ কর্ম্মচেদফলং ভবেৎ॥

* * * *

নান্যথা হ্যপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কথঞ্চন॥"

(বন—৩২— ১১,১২)

অর্থাৎ, প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। কর্ম্ম না করিলে জীবিকাবৃত্তি অসম্ভব হইত।

ন্যায়সূত্রের (৩—২—৬৪) ভাষ্য লিখিতে বাৎসায়ণ বলিয়াছেন যে কর্ম্ম করিতে হইলে শরীর থাকা চাই এবং শরীরী না হইলে কর্ম্মফল ভোগ

হইবে কিরূপে ? যথা,—"কর্ম্মনিরপেক্ষেভ্যোভূতেভ্যঃ শরীরমুৎপন্নং পুরুষার্থ-কারিত্বাদুপাদীয়তে।"

শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ম্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব এবং শরীর না থাকিলে কর্ম্ম ও হয় না। সুতরাং কোন্‌টী অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে ? শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"ন চ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভতি। ন চ শরীরমন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতীতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তেন কশ্চিদ্দোষো ভবতি।" শারীরক ভাষ্য।

অর্থাৎ, কর্ম্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, আবার শরীর ব্যতিরেকেও কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কর্ম্ম ও শরীর এই উভয়ের পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষের কোনরূপেই পরিহার হইবে না, সংসারকে অনাদি বলিয়া মানিলে, বীজাঙ্কুরন্যায়দ্বারা কর্ম্ম ও শরীরের ইতরেতরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গের উপপত্তির কোন দোষ হয় না।

(২) কারণসকল হইতে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমীকরণের (adjustment) নামই কর্ম্ম এবং ঐ সময় যাহার উপর অথবা যাহার জন্য সমীকৃত হয়, তাহার সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,—

"তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ।" (সাধন—১৪।)

অর্থাৎ, কর্ম্মসকল পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের কারণ এবং পাপদ্বারা সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হয়।

(৩) যে নিয়মের দ্বারা যথাযোগ্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যে নির্ভুল এবং নির্দ্দিষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; ইহা অনবরত বিশ্বের সাম্য স্থাপন করিতেছে।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মের নিয়ম, শক্তির অনপচয়ের (conservation of energy) নিয়মের অন্তর্গত। কর্ম্ম করিতে গেলে যে পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়, উহার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শক্তির অনপচয় হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্ত মনুষ্যের কর্ম্ম

ওজন করিয়া ফল দিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পার পায় না। ন্যায়বিচারক যমের নিকট প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্ম্মের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

(৪) এই সাম্য গ্রহণ করিতে সময় সময় বাধা এবং বিচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা বাহ্য বাধা ও বিচ্যুতি মাত্র। ঐ সময় অন্য স্থানে অন্য প্রকারে ঐ সাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কর্ম্মের গতি যোগী এবং ঋষিরা দেখিতে পান। উক্ত সাম্য বন্ধ হয় না; উহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর হয় মাত্র।

ব্যাখ্যা। কেহ অনুভব করিতে পারুন বা নাই পারুন, প্রকৃতির নিয়ম সর্ব্বত্রই কার্য্য করিতেছে। ফল উৎপন্ন না করিলে কর্ম্মরূপ শক্তির প্রকাশ হয় না। সেই জন্য সুতসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতম্ কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

মহাভারতে ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বেহি স্বং সমুত্থানমুপজীবন্তি জন্তবঃ।
অপিধাতা বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ॥"

(বন—৩২—৭)

অর্থাৎ, যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পূর্ব্ব সঙ্কল্পবশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণিসকলও আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

(৫) আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই কর্ম্মের অধীনে রহিয়াছে। ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক—এই ত্রিলোকির মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহা কর্ম্মের অধীনে নহে।

ব্যাখ্যা। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে দেবতা, মনুষ্য, জঙ্গমাদি সকলই অবস্থিত। এই জন্য মনু, কোন্ কর্ম্মের ফলে জীবের কি প্রকার যোনিতে জন্ম হয় তাহা উল্লেখ করিয়া দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষাদি স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত সকলকে

কর্ম্মের নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মনুসংহিতা-১২-৩৯ হইতে ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

(৬) কর্ম্ম কালের অধীন নহে; সুতরাং যে ব্যক্তি কালকে জানেন, তিনি কর্ম্মকেও অবগত আছেন।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষে বলিয়াছেন যে,—"তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতিবিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ ইতি।"

অর্থাৎ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশিরই দেশ, কাল নিমিত্তের স্থিরতা হয় না, অর্থাৎ কোন্ সময় যে কর্ম্মের ফল ফলিবে, তাহা মনুষ্য অবগত নহে বলিয়া কর্ম্মগতিকে বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় বলা হয়।

(৭) অপর ব্যক্তির নিকট কর্ম্মের রহস্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

ব্যাখ্যা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ," অর্থাৎ কর্ম্মের গতি অতীব দুর্জ্ঞেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ, জ্ঞানিব্যক্তিরাই কার্য্যের রহস্য অবগত আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন "অজ্ঞেয়", কর্ম্মকে সেইরূপ "অজ্ঞেয়" বলা যায় না।

(৮) কর্ম্মকারণের শৃঙ্খল অনুসন্ধান করিলে কর্ম্মের রহস্য কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

ব্যাখ্য। ব্যাসদেব, "দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্তৈকবিপাকারম্ভীভোগহেতুত্বাৎ" প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জন্মদ্বারা আমাদের পূর্ব্বকার কর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। ভোজদেবও ঐরূপ বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকারে কর্ম্মের গতি অনুমান করা যায় মাত্র। পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুর বাক্য হইতে কর্ম্মের বিবিধ গতি বুঝিতে পারা যায়।

(৯) আমাদের পূর্ব্বকার মন্বন্তরের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের কার্য্য এবং চিন্তার সমষ্টিই এই পৃথিবীর কার্য্য বলিয়া আখ্যাত হয়।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, গ্রন্থি দ্বারা সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎস্য-জালের ন্যায় চিত্ত অনাদিকাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্রী হইয়াছে। উক্ত বাসনাসমুদায় অসংখ্য জন্ম

হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকে 'অনাদি' বলিয়া গিয়াছেন।

(১০) আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবের বসতি রহিয়াছে,—পবিত্র এবং উন্নত আত্মা হইতে দুষ্টাত্মা পর্য্যন্ত, নানা প্রকার জীব পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীর কোন বিশেষ সত্তা অথবা কোন বিশেষ জাতি অপেক্ষা, পৃথিবীর স্থিতি অধিক কালব্যাপী।

(১১) পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ জাতিসকলের কর্ম্ম, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত কালে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং উহাদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বাতুলতামাত্র।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ম্ম 'অনাদি'। শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—

"অনাদৌতু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্থ চ প্রবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ, সংসার অনাদি বলিয়া বীজাঙ্কুর ন্যায় কর্ম্মদ্বারা সর্গবৈষম্য হইয়াছে।

(১২) আরব্ধ কর্ম্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে, তাই বলিয়া কোন ব্যক্তির অপর কোন জীবকে সাহায্যদানে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা—মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অন্যোহি নাশ্নাতি কৃতংহি কর্ম্ম মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতংহি কর্ম্ম তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ॥"

(বনপর্ব্ব—২০৮—২৬)

এই স্থানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃতকর্ম্মের নাশ হয় না। ব্রহ্মসূত্রে কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"পূর্ব্বসঞ্চিতে পাপপুণ্য অনারব্ধকার্য্যে অনুৎপাদিত ফলে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতো নত্বারব্ধকার্য্যে চোৎপাদিতফলে। পরমেশেচ্ছায়াঃ প্রারব্ধনাশ ইত্যাদি"। অর্থাৎ অনাদিভব-পরম্পরায় সঞ্চিত অনারব্ধ কার্য্য পাপপুণ্যেরই বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হইয়া থাকে; আরব্ধ কার্য্যের নাশ হয় না। পরমেশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধ নাশের অবধিরূপে উক্ত হইয়াছে।

তৎপরে ১৯ সূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে কেবল ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের নাশ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অশ্লেষ বা নির্লিপ্ততা দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্র দুইটী কথা বলিয়াছেন,—'অশ্লেষ' ও 'বিনাশ'। তত্ত্বজ্ঞান হইলে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের 'অশ্লেষ' অর্থাৎ নির্লিপ্ততা হইয়া থাকে। যেমন পদ্মপত্রে জল থাকিলে, জলের সহিত পত্রের কোন লিপ্ততা থাকে না, সেই প্রকার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞানী লিপ্ত হন না। তত্ত্বজ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহাতে অঙ্কুর উৎপাদক শক্তি থাকে না, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানীর সঞ্চিতকর্ম্মসম্বন্ধে হইয়া থাকে।

(১৩) কর্ম্মের ফল নিজের কিংবা অপরের চিন্তার অথবা কার্য্যের দ্বারা প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বল্পীকৃত করা যায়।

ব্যাখ্যা—হিন্দুশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে কর্ম্মকে কি প্রকারে প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বল্পীকৃত করা যায়, তাহার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। পরাশরীয়স্মৃতি কর্ম্মবিপাক নামক অধ্যায়ের টীকা লিখিতে গিয়া মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে "কি প্রকার কর্ম্ম, কি প্রকার ফল উৎপন্ন করে, তাহা এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।" এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল মাত্র অনারব্ধ কর্ম্মকেই প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বল্পীকৃত করা যায়। প্রারব্ধ কর্ম্মকে ভোগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অনারব্ধ কার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥" (৪-১-১৫)

অর্থাৎ,—অনারব্ধ কার্য্যেরই বিদ্যোদয়ে নাশ হইয়া থাকে।

মাধবাচার্য্যও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন যে,—

"তানি প্রায়শ্চিতানি সংচিতবিষয়াণি,"

অর্থাৎ কেবল সঞ্চিত কর্ম্মের জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সঞ্চিত ভিন্ন অন্য কর্ম্মের ফল শান্তি হয় না। যদি এই সকল কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ফলভোগ কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পশ্চাৎ সেই সকল ফলভোগ করিতে হইবে। তদ্ যথা :—

"অত্যুৎকটৈরিহ তৈস্তু পুণ্যপাপৈশরীরভৃৎ প্রারব্ধম্ কর্ম্ম বিচ্ছিন্ন ভুঙ্‌ক্তে তত্তৎ ফলং বুধঃ। প্রারব্ধশেষং বিচ্ছিন্ন পুনর্দেহান্তরেণ তু ভুঙ্‌ক্তে দেহিঃ ননোভুঙ্‌ক্তে তল্লভ্যয়তি কঃ পুমান্ (অবশ্যম্ অনুভোক্তব্যম্ প্রারব্ধস্য ফলম্ জনৈঃ)।"

(১৪) যদি কর্ম্মভোগ করিবার কোন উপযোগী উপাধি বা আধার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর, জাতির অথবা ব্যক্তির জীবনে, কর্ম্ম ফল উৎপন্ন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোদ্ধৃত বাৎসায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১৫) যতদিন উপযোগী উপাধি পাওয়া না যায়, ততদিন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে মাত্র।

ব্যাখ্যা। প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মটী সকলের অপেক্ষা বলবান্ তাহারই ফল অগ্রে ফলিয়া থাকে এবং মনুষ্যের শরীরকে আধার করিয়া ইহা কার্য্য করে।" ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, কতকগুলি কর্ম্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়, অর্থাৎ কতকগুলি এই জন্মে ফল প্রসব করে এবং অপর কতকগুলি জন্মান্তরে ফল প্রসব করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি যে, মাধবাচার্য্যও ঠিক ঐরূপ বলিয়াছেন,—"যদিও কিছু সময়ের জন্য ইহাদের ফল-ভোগ স্থগিত থাকে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ কর্ম্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।"

(১৬) কর্ম্ম করিবার জন্য মনুষ্যকে যেরূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই উপাধির সাহায্যে সে যখন কার্য্যের ফলভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার অনারব্ধ কর্ম্ম অপর জীবের দ্বারা এবং অন্য প্রকারে ক্ষয় হয় না, ভবিষ্যতে ভোগের নিমিত্ত উহা সঞ্চিত থাকে; কালের গতিতে কর্ম্মের শক্তির কোনরূপ হ্রাস হয় না, অথবা কর্ম্মের প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

ব্যাখ্যা। পতঞ্জলির নিম্নলিখিত যোগসূত্র হইতে এবং ব্যাসদেবলিখিত তদ্‌ভাষ্য হইতে এই সত্য উপলব্ধি হইবে। যথা,—

"সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। (সাধন-২-১৩)

অর্থাৎ চিত্তভূমিতে যখন ক্লেশ (কাম, ক্রোধাদি) থাকে, তখনই কর্ম্মাশয়ের বিপাক হয়, অর্থাৎ তখন কর্ম্ম ফল প্রসব করিয়া থাকে। ক্লেশরূপ মূলের

উচ্ছেদ হইলে ঐরূপ আর হয় না। যেমন শালিতণ্ডুল অর্থাৎ ধান্যবীজ তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দগ্ধ বীজশক্তি না হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু তুষের বিশেষ অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, তদ্রূপ ক্লেশরূপ তুষের দ্বারা আবৃত না থাকিলে অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উহা দগ্ধ করিলে, কর্ম্মের ফলোৎপত্তি হইবে না। কর্ম্মফলে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের বিচার করিতে হইবে যে একটী কর্ম্ম একটী জন্ম না অনেক জন্ম সম্পাদন করে? অথবা, অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মের অথবা একটী জন্মের কারণ? একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ, এইরূপ বলা যায় না, কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীণ অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম্মের অথবা বর্ত্তমান শরীরে যাহা করা যাইতেছে, সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কর্ম্মটার দ্বারা পরজন্ম সম্পাদিত হইবে তাহা বলা যায় না। একটী কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে, এরূপও বলা যায় না, কারণ অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে যদি একটীই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির বিপাককাল অর্থাৎ পরিণামের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না, কারণ, সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না, সুতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কর্ম্মান্তরের পরিণামের সময়াভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত মনুষ্যের বিচিত্র কর্ম্ম সকল প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ একটী কর্ম্ম প্রধান ভাবে থাকে এবং অপর কতকগুলি কর্ম্ম ঐ প্রধানের চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া থাকে, উহারা মরণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং একত্র মিলিত হইয়া একটীই জন্ম সম্পাদন করে। কর্ম্ম দুই প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—(১) নিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণামসময় অবধারিত থাকে এবং (২) অনিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণাম কি ভাবে হইবে তাহা বলা যায় না। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মকে অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান জন্ম হইতে যে সকল কর্ম্মকে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদিগকে নিয়তবিপাক বলে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মকে অনিয়তবিপাক বলে।

উহারা তিন প্রকার হইয়া থাকে, যথা—(১) কতকগুলি অঙ্কুরেই বিনাশ, প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিপাক না জন্মাইয়াই উহাদের নাশ হয়; (২) কতকগুলির আবাপগমন হয়, অর্থাৎ কোন প্রধান কর্ম্মের বিপাক-সময়ে অপ্রধানভাবে কার্য্য করে; (৩) নিয়র্তাবিপাক প্রধান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে; ইহারা একেবারে ফল প্রসব করে না, অনেক জন্মের পর ফল উৎপন্ন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'পাপাচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্ম-রাশি দুই প্রকার, একটী কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্ম্ম, অপরটী শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত; এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই পুণ্যদ্বারা গঠিত একটী কর্ম্মরাশি নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুকৃত শুক্ল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পণ্ডিতগণ ইহজন্মেই তোমার কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।'

(১৭) শরীর, মন, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সহযোগে জীবাত্মা এক জীবনে যেরূপ কার্য্য করে, পরজন্মে কর্ম্ম করিবার উপাধিও সেইরূপ পাইয়া থাকে।

(১৮) কোন জীবনের কর্ম্ম করিবার উপাধি, সেই জীবনের কর্ম্মের যথার্থ উপযোগিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১৯) একই জীবনে দুই প্রকার উপায়ে, নূতন প্রকার কর্ম্মভোগের জন্য, উক্ত উপাধিকে পরিবর্ত্তিত করা যায়:—(ক) চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্যের দ্বারা এবং ব্রতাদির ক্ষমতার দ্বারা; এবং (খ) পুরাতন কর্ম্মসকলের নির্ব্বিশেষ ক্ষয়রূপ স্বাভাবিক উপায় দ্বারা।

ব্যাখ্যা। অত্যুৎকট পুণ্য পাপের ফল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(২০) কর্ম্ম তিন প্রকারের হইয়া থাকে:—(ক) উপযুক্ত উপাধি দ্বারা ক্রিয়মাণ বা আরব্ধ কর্ম্ম, (খ) ভবিষ্যৎ কালে ভোগ করিবার জন্য সঞ্চিত বা অনারব্ধ কর্ম্ম এবং (গ) আগামী কর্ম্ম।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদান্ত সূত্র-৪-১-১৩৩১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(২১) প্রত্যেক জীব তিনটী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন:—ভূলোকে, এই শরীর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Environment) ভিতর, (খ) ভুবর্লোকে অনুরাগের (Emotion) দ্বারা এবং (গ) স্বর্লোকে মন ও বুদ্ধির দ্বারা।

(২২) কর্ম্মিক শক্তির আতিশয্যবশতঃ বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ এবং বিশেষ প্রকার কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব এইরূপ কর্ম্মকে প্রধানভাবে অবস্থিত কর্ম্ম বলিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(২৩) কর্ম্মিক শক্তির আতিশয্যবশতঃ কোন জীব অথবা পরিবারস্থ কতকগুলি জীব, ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, উপর্য্যুপরি এই প্রকারে উহাদের তিন জন্ম হয় এবং উহারা স্ত্রীপুরুষভেদে যে যেরূপ সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তিন জন্ম ঠিক্ সেই প্রকার হইয়া থাকে।

(২৪) তত্ত্বদর্শী ঋষি ভিন্ন অপরে কেহ অন্যের কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন না। সেই জন্য সকলে যখন কর্ম্মফল ভোগ করে, তখন বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যদিও অন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সেইরূপ অন্যায় নহে। দারিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে অথবা ভীষণ পরীক্ষার ভিতর অবস্থান করিলে আমরা কর্ম্মের দোষ দিতে পারি না। এইরূপ অবস্থার দ্বারা জীবের শিক্ষা হয় এবং জীব বল, ধৈর্য্য এবং সহানুভূতি শিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়।

ব্যাখ্যা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে পণ্ডিতগণই কর্ম্মকে অবগত হইয়া থাকেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্যের গল্পে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি অতীত জন্মের কর্ম্মের ফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানসত্ত্বেও কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছিলেন।

(২৫) জাতিগত কর্ম্ম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করিয়া থাকে, বংশগত কর্ম্ম বংশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করে।

ব্যাখা। সুতরাং মনুষ্য নিজেকে স্বাধীন ভাবিলেও সে যে জাতিগত, বংশগত অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রগত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

(২৬) কর্ম্মের এমত শক্তি আছে, যে স্বর্লোকের জীবের দ্বারা প্রকৃতির বিপ্লব হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে গেলে আমরা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ

কারণ-এই দেখি যে, আভ্যন্তরিক অগ্নির দ্বারা, অথবা জলবায়ুর দ্বারা ঐরূপ প্রকৃতির বিপ্লব হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যের চিন্তাশক্তির ক্রিয়মাণ (Dynamic) শক্তির দ্বারা ঐরূপ বিপ্লব হইয়া থাকে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিযুগের শেষে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্ম্ম কর্ম্মের অনাদরের জন্য দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, ও প্রকৃতির বিপ্লব সংঘটিত হইবে এবং তাহার ফলে অসংখ্য প্রাণী নষ্ট হইবে।

(২৭) পৃথিবীর যে অংশ বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই অংশের সহিত যে সকল জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ নহে, তাহারা দুইটী উপায়ে ঐ বিপ্লব হইতে উদ্ধার পায়ঃ—(ক) তাহাদের অন্তরে এমন ভাবের উদয় হয় যে তাহারা ঐ স্থান বিপ্লবের পূর্ব্বেই ত্যাগ করে। (খ) যে সকল মহতীসত্তা পৃথিবীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল জীবকে সাবধান করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে অন্যত্র স্থাপন করেন।

(২৮) তত্ত্বজ্ঞান হইলে যে প্রারব্ধেরও নাশ হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্যাত্তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্।
তত্তু জন্মন্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ॥"

অপরোক্ষানুভূতি।

অর্থাৎ জাগ্রত হইলে মনুষ্যের নিকট যেমন স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে দেহাদি অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় সুতরাং দেহাদি না থাকিলে প্রারব্ধ কর্ম্মেরও অস্তিত্ব থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে জন্মান্তরের অভাব হয়, সুতরাং জন্মান্তরীণ প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে না।

টীকা। কর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে কর্ম্ম-সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে; তাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

উপসংহার।

—০—

পরিশেষে কর্ত্তব্য এই যে, হিন্দুধর্ম্মের অটল অচল ভিত্তি যে সকল ইষ্টকের উপর স্থাপিত, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সামান্য কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকল হিন্দু মাত্রেই কর্ম্মের ফল মানিয়া থাকেন। কর্ম্মফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাঁহারা দুঃখে, যন্ত্রণায় অধীর হইয়াও ভগবানের দোষ দেন না; ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এদেশের সামান্য ব্যক্তিরা দর্শনের তথ্য সকল অবগত না হইলেও, মনে মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, মনুষ্য বার বার এই পৃথিবীতে আসিতেছে,—তাহার জন্মের পর জন্ম হইতেছে; সে এক জন্মে যে কার্য্য করে, জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যেমন বীজ বপন করে, তেমনি ফল পাইয়া থাকে এই বিশ্ব সংসার যে কাহারও 'খেয়ালের' দ্বারা চালিত নহে, ইহার ভিতর যে একটী গূঢ় নিয়ম রহিয়াছে—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই যে সেই নিয়মের অন্তর্গত, তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম। বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা, জ্যোতিষের আলোচনার দ্বারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার দ্বারা আমরা কর্ম্মের নিয়মের অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ অবগত হইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে জীবন সমস্যার কুজ্ঝটিকা দূর করিতে কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

জন্মান্তর-রহস্য।

একাদশ প্রস্তাব।

(পাশ্চাত্যমতের সমালোচনা।)

হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট পুনর্জন্ম (Reincarnation) নূতন কথা নহে। জন্মান্তরবাদ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনের অন্তর্ভূত। পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। ডারুবিন (Darwin) অথবা মোসেস্-প্রমুখ (Moses) ধর্ম্মবীরগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ধ্রুব সত্য। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ করিয়া লয়, তৎপরে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন হয় অনন্ত স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে জন্মাইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং কোথা হইতেই বা সে আসিতেছে,—ইহার উত্তরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ নীরব। তাঁহারা অতীত জন্ম মানেন না এবং বলেন যে, জীবের অস্তিত্ব এই জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে মনুষ্যের আত্মা একটী যষ্টির ন্যায়,—এই যষ্টির এক প্রান্ত মনুষ্যের হস্তে রহিয়াছে এবং অন্য প্রান্ত অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ যষ্টি যেমন মনুষ্যের হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে মিশিয়াছে, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে মিশিয়াছে। যাহার এক প্রান্ত অনন্তে বিস্তৃত, তাহার অন্য প্রান্তও অনন্তে বিস্তৃত হওয়া চাই, নতুবা ঐরূপ যষ্টির অস্তিত্বের কল্পনাও অসম্ভব; সেইরূপ, আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া পরজন্মে অনন্তে মিশিতে পারে না, অনন্তে মিশিতে হইলে তাহার উৎপত্তিও অনন্তে মানিতে হইবে। সুতরাং পাশ্চাত্যদিগের মত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস দুই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই ভিত্তিদ্বয় প্রতীচ্য সভ্যজাতিরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই।

প্রথম ভিত্তি হইতেছে, ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক উৎপত্তিতে (Spiritual origin of evolution) বিশ্বাস, এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে, মনুষ্যের ভিতর যে সূত্ররূপী আত্মা রহিয়াছে,—যাহাকে আমরা 'অহং' (self) বলিয়া থাকি তাহাতে বিশ্বাস। এই আত্মা অনন্তের পথে চলিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার বিকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই আত্মাই মনুষ্যের দেহকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে এবং মৃত্যুর পর অল্পাধিক সময়ের মধ্যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রস্থান করিতেছে। যেমন সূত্রে মুক্তা সকল গ্রথিত থাকে, সেই প্রকার এই সূত্রাত্মায় মনুষ্যের বিভিন্ন জীবন গ্রথিত রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার জীব বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ সৃষ্টির উচ্চ সোপানে এবং কেহ বা নিম্ন সোপানে রহিয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় সৃষ্টি এক সঙ্গে ধরিতে গেলে, উহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। তাহাদিগের আরও ধারণা এইরূপ যে, সৃষ্টির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি, তাহাদিগের জাতীয় হিসাবে পূর্ণ (perfect),—যেমন একটী মৎস্য তাহার জাতীয় হিসাবে সম্পূর্ণ, তাহাকে একটী অসম্পূর্ণ পক্ষী বলা যায় না, কিংবা কোন পক্ষীকে একটী স্তন্যপায়ী জীব (mammal) বলা যায় না।

নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার নির্দ্ধারণ করাই হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য,—প্রথমতঃ, সমুদয় সৃষ্টির ক্রমোন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সম্পূর্ণতা-বিধান। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় তাঁহারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ (Types) পাইয়া সন্তুষ্ট হন না, কিংবা এইরূপ বলেন না যে, কতকগুলি আদর্শ ক্রমশঃ বিকাশ পাইয়া, মনুষ্যরূপে পরিণত হইতেছে এবং অন্য আদর্শসকল বিভিন্ন দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কোনটী বা উদ্ভিদ্ এবং কোনটী বা জন্তুরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচ্যেরা ঐ দুইটী বিষয় এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত বস্তু সেই জাতীয়ের উপযোগী জীবাত্মা দ্বারা অনু-প্রাণিত হইতেছে; প্রত্যেক জীবাত্মাকে সূত্রাত্মা বলা হয় এবং যে পঞ্চভৌতিক আকৃতিকে উহা অনুপ্রাণিত করে, সেই পার্থিব শরীরের সসীমত্বের উপর,

উহার পার্থিব বিকাশের শক্তি, সেই সময়ের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে ; এবং উক্ত প্রকার আকৃতির সম্ভবানুসারে উহার কামনাসকলও বাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উহার পার্থিব শরীরের সম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিলে উহা সুখী হয়, এবং অসম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইলে দুঃখ অনুভব করে। যেমন, যখন কোন প্রাণী মৎস্যের শরীরে বাস করে, তখন পক্ষীর ন্যায় ইহার উড্ডীয়মান হইবার, অথবা বাঁদরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, উহার ঐরূপ কামনাই হয় না। ইহা যত কাল মৎস্যজন্ম গ্রহণ করিবে, কতকাল তাহার মৎস্যরূপ জন্মের সংবিতে ঐ প্রকার উড্ডীয়মান হইবার অথবা বৃক্ষারোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদয় হইবে না এবং তজ্জন্য তাহাকে দুঃখিত চিত্তে কাল যাপনও করিতে হইবে না। প্রাচ্য মনীষিগণের মত এইরূপ নহে যে মনুষ্যের আত্মা অথবা অপর কোন জন্তুর আত্মা অনন্তকাল ধরিয়া, কেবল মাত্র তাহার জাতীয় গুণসকল (Characteristics) সংগ্রহ করিতে ক্রমবিকাশের (Evolution) পথে অগ্রসর হইবে। সেই জন্য পাশ্চাত্যদিগের যে ধারণা আছে যে, মনুষ্যের ক্রমশঃ বিকাশ হওয়াতে ভবিষ্যৎ কালে মানবসমূহ সমুন্নত ও গৌরবান্বিত 'রাম', 'শ্যাম' অথবা 'হরি' রূপে পরিণত হইবে—সেই ধারণাকে তাঁহারা অসার বলিয়া ত্যাগ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যেমন অন্যান্য অবস্থাসকল উন্নতির চরমসীমা নহে, সেইরূপ মনুষ্যত্বও উন্নতির চরমসীমা নহে এবং যেমন শিক্ষা কিম্বা ধৌতি দ্বারা কোন শৃগাল কিম্বা গর্দ্দভকে মনুষ্যসমাজের উপযুক্ত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা, শরীরের মলধৌতির দ্বারা অথবা সুশিক্ষার দ্বারা যতই কোন ব্যক্তিকে সুসভ্য করা হউক না কেন, সে কখনই স্বর্গীয় বাসের এবং স্বর্গীয় সমাজের যোগ্য হইবে না। প্রাচ্যেরা এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, যখন কোন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে পর পর বাস করিতে থাকে, তখন ইহার বিকাশের জন্য, প্রত্যেক নূতন পাত্র বা উপাধির শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্যানুসারে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে ইহার সংবিতের প্রসারণ (Expansion) হইতে থাকে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার যখন বিকাশ হয়, তখন ইহাতে যদি অসীম প্রসারণের ক্ষমতা গুপ্তভাবে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিত

না। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, যদি বাষ্পের প্রসারণের (expansive) ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে বাষ্পীয় যন্ত্রের দণ্ড (piston). কখন পরিচালিত হইত না,—এই প্রসারণের ক্ষমতাকে প্রাচ্যেরা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বটবৃক্ষের ফলের ভিতর প্রসারণের ক্ষমতা বা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়াই, ঐ ক্ষুদ্র বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আত্মারই ঐরূপ প্রসারণের ক্ষমতা আছে।

আধুনিক সুসভ্যজগৎ ক্রমবিকাশকে (Evolution) যে 'স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের' ('Spontaneous Variation') কারণ স্বরূপ বলেন,—যাহা মানিতে হইলে এই বিশ্বকে একটী বিশাল সংঘটনের (accident) ফলস্বরূপ বলিতে হয়,—তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের অস্তিত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা, কোন অনুসন্ধিৎসু বালকের তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। যাঁহারা বলেন যে, এই বিশ্ব কোন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত নহে, কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন' এবং 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' (Survival of the Fittest),—এই দুই নীতির দ্বারা চালিত হইতেছে, তাঁহারা একবার ভাবেন না যে, কেমন করিয়া একই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অন্য গ্রহ উপগ্রহেও সংঘটিত হইয়া স্থায়িরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে—অথচ, কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহ অপর কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে না। একই মূল ছাঁচ (mould) হইতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে,—এইরূপ বাক্যের ন্যায় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত মতও অতীব হাস্যাস্পদ। সেই জন্যই, যে ছাঁচ হইতে একই প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রাচ্যেরা এইরূপ একটী মহান্ ছাঁচের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ ছাঁচটীকে তাঁহারা একটী নিয়ম বলিয়া অবগত আছেন এবং বলেন যে, ঐ মহান্ নিয়ম অনুসারে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। ঐ নিয়মটীকে আত্মার অন্তর্বিকাশ বা পরিণমন (Involution of Spirit) বলা হয়।

মহামতি ডরুবিন (Darwin) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের জন্য আমরা মাটীর পোকাদিগের (Earth-worms) নিকট ঋণী;

ঐ পোকা না থাকিলে জমী (soil) প্রস্তুত হইত না, জমী প্রস্তুত না হইলে উদ্ভিদ্ রাজত্বের সৃষ্টি হইত না এবং উদ্ভিদ্ রাজত্বের সৃষ্টি না হইলে জীব রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। প্রাচ্যেরাও ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং বলেন যে, অবিকল পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে অন্তর্বিকাশের নিয়ম (Law of Involution) পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন জীবাত্মা (Ego)—বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে—যদিও সামান্য কার্য্য করিবার জন্য বিকাশোন্মুখ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা তখন মহৎ কার্য্য করিবার সূত্রপাত করে। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সে তাহার ভিত্তি স্থাপিত করিয়া লয়; ভিত্তি স্থাপিত হইলে উহা তখন অন্যান্য যন্ত্রাদি লইয়া—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে—তদপেক্ষা উন্নত কার্য্য আরম্ভ করে; সেই কার্য্য শেষ হইলে অন্য যন্ত্র লইয়া তাহা অপেক্ষা কঠিন এবং বিস্তৃত কার্য্য করিতে থাকে; কিন্তু বিকাশের (manifestation) এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহারা একই জীবাত্মা (Ego) মাত্র,—ঠিক যেমন একই ব্যক্তি, যখন রন্ধন করে, তখন 'রাঁধুনি' ব্রাহ্মণ হয়, যখন পূজা করে, তখন 'পূজারি' হয়, যখন আফিসে যায়, তখন 'কেরানী' হয় এবং যখন বিস্কুট বিক্রয় করে, তখন 'বিস্কুটওয়ালা' হয়। সমাজের উচ্চ-নীচ সোপানে দাঁড়াইয়া, কেহ যেমন তুলার চাষ করিতেছে, কেহ তাহাকে বিক্রয় করিতেছে, কেহ তাহাকে ধুনিতেছে, কেহ সূত্র প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কেহ বা সেই বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং যেমন একই সময়ে ঐ সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে, সেই প্রকার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় জীবাত্মা (Ego) সমূহের কার্য্য ক্রমাগত এবং পরপর হইয়া যাইতেছে এবং এই প্রকার ক্রমান্বয়ে কার্য্য হইতেছে বলিয়া আমরা এই বাসোপযোগী পৃথিবীর অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছি।

অন্তর্বিকাশ-বাদীরা (Involutionists) বলেন যে, জীবাত্মার (Ego) অসীম প্রসারণের ক্ষমতা আছে। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) বলেন এবং প্রাচ্যেরা যাহাকে অন্তর্বিকাশ (Involution) বলেন, সেই উভয়ের ধারা একই প্রকার,—তবে ভিন্ন আলোকে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। যখন জীবাত্মার (Ego) প্রতীচ্য মতানুসারে

ক্রমাভিব্যক্তি হয়, অথবা প্রাচ্য মতানুযায়ী অন্তর্বিকাশ হয়, তখন কি প্রকারে উহার প্রসার হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, নিম্নলিখিত দুইটী চাপের (Pressures) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে, —প্রথমতঃ, চতুর্দ্দিকৃস্থ সসীম বাহ্য চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবিকাশের জন্য আত্মার প্রসারণরূপ আভ্যন্তরিক চাপ। যখন এই দুইটী চাপ সমান ও স্থায়ী হইয়া যায়, তখন ইহার বৃদ্ধি বা বিকাশ আর হয় না; যেমন কতকগুলি নিম্ন অবস্থায় জৈবিক বিকাশ অতি পুরাকালে যাহা ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। যখন কোন প্রাণীর চতুর্দ্দিকৃস্থ বাহ্য চাপ, অন্তঃস্থ শক্তির চাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই প্রাণীর ধ্বংস হইয়া থাকে; এবং যখন আভ্যন্তরিক চাপের আধিক্য ঘটে, তখন নূতন ও উন্নত জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেমন পুরাতন বৃক্ষে নূতন 'কলম' প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ঐ চাপের আধিক্য ঘটিলে পুরাতন বংশে নূতন নূতন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির আবির্ভাব হয়।

বিষয় দুইটী একই প্রকার, কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকা বশতঃ অন্তর্বিকাশ ও ক্রমবিকাশ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্য সৃষ্টির অতি নিম্ন স্তর হইতে আসিতেছে— মনুষ্যের জীবাত্মা (Ego) ক্রমান্বয়ে গ্রন্থিলজীব (Mollusc), মৎস্য, পক্ষী এবং অবশেষে পশুর ভিতর দিয়া আসিয়া এবং প্রত্যেক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। অন্তর্বিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্যের ভিতর যে আত্মা (Ego) রহিয়াছে, তাহা যে বহুযুগপূর্ব্বে ঐ সকল নিম্নস্তরের প্রাণীর ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মনুষ্যের আত্মার যে ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি অথবা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই দুই মতের ভিতর যে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মনে করুন একটী গৃহে ক্রমবিকাশবাদী এবং অন্তর্বিকাশবাদী দুইজন দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্মুখের গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া কেহ যেন সেই গৃহে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের সম্মুখস্থ গৃহভিত্তিতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল,—কেমন করিয়া যে

ছিদ্র হইল, তাহা তাঁহারা জানেন না; তাহার পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটী অঙ্গুলী বাহির হইল। তৎপরে তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, সেই অঙ্গুলিটী পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল; এবং ছিদ্রটী ঈষৎ বর্দ্ধিত হইল, ও তাহার ভিতর দিয়া একটী হস্ত বাহির হইল। ছিদ্রটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহার ভিতর দিয়া যথাক্রমে মস্তক ও স্কন্ধাদি বাহির হইতে লাগিল এবং অবশেষে ছিদ্রটী এত বিস্তৃত হইল যে, উহার ভিতর দিয়া একটী মনুষ্য অক্লেশে বাহির হইয়া আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়া ক্রমবিকাশবাদী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! অঙ্গুলিটী একটী হস্ত হইল, হস্ত খানি মস্তক হইল এবং মস্তকটী মনুষ্য হইল! কিন্তু পদের অঙ্গুলি অগ্রে বহির্গত না হইয়া, হস্তের অঙ্গুলি বহির্গত হইল কেন? পদের পরিবর্ত্তে প্রথমে হস্তই বা বহির্গত হইল কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে যে সংকল্প (design) ছিল, তাহা প্রকাশ পায় এবং তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে বলা যায়? সুতরাং ঐরূপ ধারণা অসম্ভব। 'স্বতঃ বিস্তার' (Spontaneous Enlargement) এবং 'যোগ্যতমের উদ্গমন' (Protrusion of the fittest) এই দুই নিয়মের দ্বারাই ক্রমবিকাশ পরিচালিত হইতেছে।" কিন্তু অন্তর্বিকাশবাদী বলিবেন "বন্ধো! তুমি যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবিতেছ, তাহা অপেক্ষা উহা আরও আশ্চর্য্যকর; সমস্ত ক্ষণ ধরিয়া ঐ মনুষ্যটী প্রাচীরে অপর পার্শ্বে ছিল; এবং আমরা যে সকল ঘটনা দেখিতেছিলাম, তাহা উহারই কৃত; সে প্রথমে প্রাচীরে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করে, পরে ঐ ছিদ্রটী বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে তাহার উপযোগী বিস্তৃত হইলে সে তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আইসে।"

কিন্তু অন্তর্বিকাশবাদী কখনও বলিবেন না যে, এই প্রকাশমান মনুষ্য-জীবন জীবাত্মার (Ego) সম্পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অজ্ঞেয় ও অপরিমেয় আত্মা ছিদ্রটীর সম্পূর্ণ বিস্তৃতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে যাহা হউক, উক্ত বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং কর্ম্ম ও জন্ম হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করিয়াছি। প্রাচ্যদের মতে এক একটী পার্থিব জীবন, জন্ম ও মৃত্যুরূপ দুই শেষ প্রান্তের ভিতরে সূত্ররূপী

আত্মার এক এক বার স্পন্দনমাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া অসংযত শক্তিতে ঐ সূত্র স্পন্দিত হইতেছে। ঐরূপ প্রত্যেক স্পন্দনের অর্থ হইতেছে যে, এক একটী নূতন মন এবং তদুপযুক্ত এক একটী নূতন শরীরধারণ,—যাহাকে একত্রিত করিয়া 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বলা হয়। সূত্রে যেরূপ মুক্তা গ্রথিত থাকে, আত্মারূপী সূত্রে এক একটী 'ব্যক্তিত্ব' সেই প্রকারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। জন্মান্তরবাদের এই অংশ লইয়া পাশ্চাত্যেরা মহা-গোলযোগে পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করেন যে, "মনের এবং শরীরের যদি পুনরবতারণা বা পুনর্জন্ম না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি গুণ বা দোষের সমষ্টি, অথবা কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ সংস্কার বা কতকগুলি বিদ্যার সমষ্টি,—যাহাকে আমরা 'রাম' 'শ্যাম', অথবা 'হরি' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি,—তাহাদিগের কখনও পুনর্জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং মৃত 'রামের' কর্ম্মফল একজন নূতন 'শ্যাম' বা 'হরির' উপরে আসিয়াছে, এইরূপ বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহা ভিন্ন, পূর্ব্বোক্ত গুণ, দোষ ইত্যাদির সমষ্টিকেই আমরা ভালবাসি এবং অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের সহিত লইয়া যাইতে চাই।"

প্রাচ্যেরা বলেন যে, তুমি তোমার প্রিয়জনের যাহা ভালবাস, অথবা তোমার প্রিয়জন তোমার যাহা ভাল বাসেন,—তুমি যাহাকে দোষ গুণ ইত্যাদির সমষ্টি বলিতেছ,—তাহা ক্ষণস্থায়ী 'অহং' নহে, তাহার ধ্বংস হয় না। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচ্যদিগকে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান করিতে আসিয়া থাকেন তাহাদের 'অহং' (self) সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দেখিয়া প্রাচ্যেরা বিস্মিত হন। ক্ষণস্থায়ী 'অহং'—যাহাকে 'ব্যক্তিত্ব' বলা হয়, এবং যে 'অহং' অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে,—সেই 'অহং'এর ভিতর যে কি পার্থক্য আছে, তাহা ঐ সকল পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না; এবং ঐরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের অজ্ঞতার কারণ হইতেছে, শিক্ষার দোষ। পাশ্চাত্যেরা তাঁহা-দিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে এইরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক স্মৃতির বাসের স্থান এবং ভাণ্ডার বিশেষ এবং স্মৃতি আছে বলিয়াই আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, "আমার অস্তিত্ব" এবং "আমার

রাম বলিয়া অস্তিত্ব" এই দুইটী জ্ঞান দুইটী বিভিন্ন প্রকার সংবিতের উপর স্থাপিত এবং আমাদের মস্তিষ্কের সহিত আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহে; কিন্তু ঐ আত্মারূপী সূত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং ঐ একমাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানই উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত সকল সজীব পদার্থে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন সজীব পদার্থ ঐ জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না এবং ঐ জ্ঞান রহিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ সজীব রহিয়াছে। প্রাচ্য দর্শনে "আমার অস্তিত্ব" (I am) এবং "আমার রাম বলিয়া অস্তিত্ব" (I am Ram) এই দুইপ্রকার সংবিতের ভিন্নতার উপর সমস্ত মনোবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীচ্য দর্শনে এই দুই প্রকার বিভিন্ন সংবিতের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। মনুষ্যের ভিতর যাহা চিরস্থায়িরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অবগত হওয়ার নামই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং মনুষ্য যখন সেই আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এই আত্মজ্ঞান কি প্রকার? 'আমি' অর্থাৎ জীবাত্মা (Ego) যে অনন্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং সম্পূর্ণতার আধার, এবং ঐ সকল 'আমারই' গুণ বলিয়া কেহ আমাকে ঐ সকল গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,—এইরূপ জ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। কিন্তু ঐ সকল ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে আমি এক্ষণে পরিচালনা করিতে, ধারণা করিতে, কিম্বা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না, কারণ, এক্ষণে আমার মনের ও শরীরের প্রত্যেক শক্তি উহাদিগকে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করিয়া চাপিয়া রহিয়াছে এবং আমি যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চাই, সেই পূর্ণতাকে উহারা অনিশ্চিত ও সংশয়পূর্ণ আশামরীচিকায় পরিণত করিয়াছে।

প্রাচ্যেরা বলেন যে, আমাদের গাত্রাবরণকে যেমন আমরা 'আমি' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, সেই প্রকার আমাদের শরীররূপ আবরণকে আমরা যথার্থ 'আমি' বলিতে পারি না। মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যের যথার্থ 'আমি'। এই চিন্তাশীল জীবাত্মা (Ego) আছে বলিয়াই মনুষ্যকে জন্তু হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। যদি কোন উন্মাদের মধ্য হইতে এই চিন্তাশীল জীবাত্মাকে উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে যদিও মনুষ্যের ন্যায় থাকে, তত্রাচ তাহার এবং পশুর ভিতর কোনই প্রভেদ থাকে না; এই জীবাত্মাতে (Ego) জন্মজন্মান্তরের ভূয়োদর্শন সঞ্চিত থাকে। এই আত্মাই বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহাতেই স্মৃতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান

(Intuition) এবং ইচ্ছা নিহিত থাকে। ইহাদিগকে আত্মার কিরণ বলা যাইতে পারে। ইহারা আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। যেমন কেবল মাত্র বীণা হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হয় না, সেইরূপ কেবলমাত্র মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার স্রোত বহির্গত হয় না;—উভয় উদাহরণে একজন যন্ত্রীর প্রয়োজন। যন্ত্রী না থাকিলে যন্ত্র কোন প্রয়োজনে আসে না। কিন্তু যন্ত্রীর নিজকে যন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যন্ত্রের সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদের শরীর যন্ত্রের ন্যায় এবং আমাদের জীবাত্মা (Ego) যন্ত্রীর ন্যায়। শরীর ত্যাগ করিয়া আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের শরীর রূপ আবরণ এবং তাহার সহিত আমাদের 'ক্ষুদ্-ব্যক্তিত্ব' (Personality) জন্মান্তরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচ্যেরা জন্মান্তরকে অন্তর্বিকাশরূপ যন্ত্রের কার্য্যবিশেষ বলিয়া অবগত আছেন, এবং তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে গেলে আত্মার অন্তর্বিকাশকেই স্বভাবতঃ প্রথম সোপান বলিতে হয়। কারণ, অন্তর্বিকাশ (Involution) বাদ দিয়া কেবলমাত্র ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) আলোচনা করাও যে প্রকার, আর, কোন মনুষ্যের 'আয়' বাদ দিয়া কেবল-মাত্র তাহার 'ব্যয়' সম্বন্ধে আলোচনা করাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য মনীষিগণ যখন সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া এই বিশ্ব, প্রতিযোগিতার (Competition) উপর অর্থাৎ সাধারণ অন্যোন্য সত্তা-সংরক্ষণের চেষ্টার (Struggle for existence) উপর নির্ভর করিতেছে,—এই প্রকার মতে উপনীত হন, তখন প্রাচ্যেরা তাঁহাদের ঐ প্রকার মত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অবগত আছেন যে, এই বিশ্ব সংযোগিতার (Co-operation) ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য অন্তর্বিকাশবাদীরা ইহা মানিয়া থাকেন যে, প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, কারণ উহা যে কেবল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, উন্নতির জন্যও প্রয়োজনে আসিয়া থাকে; কিন্তু প্রাচ্যেরা জানেন যে, প্রতিযোগিতার মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিলে, আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, এমন জীবসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করিয়া, উহা স্বীয় উন্নতির উপায় স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং তাঁহারা আরও অবগত আছেন যে, যে সহযোগিতার নিয়ম (Law of Co-operation) প্রতিযোগিতার

নিয়ম (Law of Competition) অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, সেই সহযোগিতার মূলে উহা কুঠারাঘাত করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা সহযোগিতার যাহা দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের স্বকীয় স্বার্থসাধনের পন্থাবিশেষ। প্রাচ্যেরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব সহযোগিতাসম্ভূত, প্রতিযোগিতাসম্ভূত নহে। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ যে, সহযোগিতা হইতে সংযোগ, সমবেত, গঠন এবং উন্নতি হইয়া থকে। নূতন ক্ষমতাসমূহ আহরণ করার নামই সহযোগিতা, যদি ইহাকে সুনিয়মে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশের, সুতরাং সমুদয়ের,—সুখ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু যখন প্রতিযোগিতার মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং অপরের স্বত্বে আক্রোশ জন্মায়, তখন বিসম্বাদ, অনৈক্য, অনিয়ম ও ধ্বংস হয় এবং উহা অন্যায় বিচার ও মহা অনিষ্ট রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে প্রত্যেক জন্তুর সহজ জ্ঞানের (Instincts) ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে ঐ জন্তুর বিকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের সংবিতের যত প্রসারণ হইতে থাকে, তাহাদের সহজ জ্ঞানেরও তত পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং উহারা কতকগুলি পুরাতন সহজজ্ঞান ত্যাগ এবং কতকগুলি নূতন সহজজ্ঞান গ্রহণ করিতে থাকে। নিম্ন স্তরের প্রাণীদের 'অনুবর্ত্তন অথবা মৃত্যু' (Confirm or Die) এই নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। মনুষ্য অন্য প্রাণীদের ন্যায় একেবারে অবস্থার দাস হইয়া পড়ে না, তাহাদের উন্নতির নূতন নিয়ম না মানিয়াও তাহারা বুদ্ধিবলে মৃত্যুরূপ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে এবং তাহাদের পূর্ব্বকার এবং নিম্নস্তরের উন্নতিতে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। পাশবিক (animal) অবস্থা হইতে মানবীয় অবস্থায় আসিতে তাহাদের সংবিতের প্রসারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাদের উপযোগী মানবীয় সহজ জ্ঞান (human instincts) ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিম্নস্তরের পাশবিক সহজ জ্ঞান (animal instincts) গ্রহণ করে; এবং পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত থাকাতে সেই অনুসারে চলা তাহাদের পক্ষে সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং নূতন নিয়ম অনুসারে,—অর্থাৎ সহযোগিতার (Co-operation) সহজ জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রতিযোগিতার (Competition) সহজ জ্ঞান হ্রাস করিয়া,—রীতিমত চলিতে সক্ষম হইবার জন্য এখনও মনুষ্যদিগকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক (Intellectual) এবং

রাগমূলক (Emotional) সহযোগিতাই প্রকৃত সহযোগিতা, অর্থাৎ যখন আপনা আপনি, এবং বিচার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তার দ্বারা, অনুভবের দ্বারা এবং অনুরাগের (Emotion) দ্বারা অন্য লোকের সুখদুঃখ, আমাদের নিজেদের বলিয়া বোধ হইবে, তখনই প্রকৃত সহযোগিতা বলা যাইবে। মনুষ্য-জীবনের এইরূপ সহজ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সহজ জ্ঞান। প্রকৃতি সকলের নিকট সমপ্রাণতা (Harmony) চায়, এবং মনুষ্যজাতি শত কামনা ও বাসনাযুক্ত হইয়াও যদি শান্তি ও সম-প্রাণতার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সহযোগিতা (Co-operation) ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই।

কিরূপে সহজ জ্ঞানের (Instincts) পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা নিম্ন-লিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সমুদ্র কিংবা নদীর তীরস্থ পাহাড়ে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা জীবনের প্রথম অংশ পাহাড়ে কাটাইয়া থাকে, তাহার পর সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের নিকট যে সকল খাদ্য আসিয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য যখন তাহারা আহরণ করে, তখন তাহাদের সহজ জ্ঞান অনুসারে আহৃত খাদ্যসমূহকে নিজের স্বত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকে; সুতরাং তখন শান্তিতে এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করিতে থাকে। তখন তাহারা প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না, কিংবা সহযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। কিন্তু তাহারা যখন সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের জাতীয় অপর প্রাণীরাও সমান ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, একই সময়ে যে কোন খাদ্য তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং গ্রহণ করিবার সমান অধিকারও আছে। এইরূপে প্রতিযোগিতা ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর লইয়া যাইলেই, উহা ধ্বংসের কারণ হয় এবং সাধারণ সমপ্রাণতাকে নষ্ট করে; সুতরাং শীঘ্রই ঐ সকল প্রাণীদিগের হিংসা দূরে যায় এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা ও সমপ্রাণতা উপস্থিত হয় এবং অব-শেষে প্রত্যেক প্রাণী তাহার প্রতিবেশীর অংশের উপর লোভ না করিয়া, নিজে নিজের অংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে। প্রাণিগণ যতই অন্তর্বিকাশের সোপানপরম্পরায় অধিরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের জীবন জটিল হইতে থাকে এবং ততই ধীরে ধীরে এবং বিশেষ কষ্টের সহিত তাহাদের পুরা-তন সহজজ্ঞানের লোপ পাইতে থাকে এবং নূতন সহজ জ্ঞানের বীজ রোপিত

হয়। মনুষ্যদের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া থাকা অর্থে সমপ্রাণতা ও পরদুঃখকাতরতা বুঝাইয়া থাকে এবং পার্থক্যতা অর্থে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগীতা বুঝাইয়া থাকে। মন্দ হইতে ভাল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরাতন বা নীচ সহজজ্ঞান সকল বলবতী থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য পুরাতন সহজ জ্ঞানসমূহকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে সৎ অভ্যাসের (habits) প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, সৎ সহজ জ্ঞানেরও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের চিরস্থায়ী 'আমিতে' সহজ জ্ঞান (instincts) বাস করে এবং ক্ষণস্থায়ী 'আমিতে' অভ্যাস (habits) বাস করে। যাহাকে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি বলা যায়, তাহা তাহার স্বকায় (individual), ব্যক্তিগত (personal) নহে এবং সেই উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের পুরাতন সহজ জ্ঞান সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নূতন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সৎ সহজ জ্ঞান সমূহের বীজ বপন করিতে হইবে। কি উপায়ে এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে,—তাহার উত্তরে প্রাচ্য জ্ঞানীরা বলেন যে, জন্মান্তর ইহার একমাত্র উপায়। কোন বিষয়ের পুষ্টি সাধন বলিলে যেমন সেই বিষয়ের বয়োজীর্ণ এবং নিষ্ফল অংশসমূহের ত্যাগ এবং সার অংশ সমূহের শোষণকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের উন্নতিসাধন বলিলে তাহার ক্ষণস্থায়ী "ব্যক্তিত্বের" (personality) ধ্বংস বুঝাইয়া থাকে এবং তাহার সহিত তাহার প্রত্যেক পার্থিব জীবনে সে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং রাগমূলক বিষয় আহরণ করিয়া থাকে, তাহার অসার অংশ সমূহের (যেমন, নির্ব্বুদ্ধিতা, মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং গর্ব্ব প্রভৃতির) ত্যাগও বুঝাইয়া থাকে। এই সকল অসার অংশ আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে আমরা আমাদের পুষ্টিকর অংশ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে এবং এমন কি, ইহাদিগের স্বরূপনির্দ্ধারণ করিতেও পারি না; এই সকল অসার, এবং ধ্বংসকারী অবশিষ্ট অংশ সকল আমাদের পূর্ব্বকার পাশবিক অবস্থারই উপযোগী। সকলেই অবগত আছেন যে যখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়া থাকি, সেইরূপ এক জন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি বা উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। যখন আত্মা "হিসাব নিকাশ" করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তখন পুরাতন ভুল ও অন্ধ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনে

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং আত্মা যখন বিশ্রাম লইতে গিয়াছিল, তখন কালপ্রবাহে সংসারে যে সকল নূতন বিষয়ের এবং নূতন চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ও চিন্তার গঠনোপযোগী নমনীয় (plastic) মন লইয়া অবতীর্ণ হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যেরা ক্রমবিকাশবাদ অবলম্বন করিয়া যেরূপে সৃষ্টির মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, ক্রমবিকাশের জন্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদিগের ঐ ধারণা ঠিক নহে; তাঁহাদের মতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ শুদ্ধা 'চিৎ' হইতে এই জগৎ রূপ বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব অন্তর্বিকাশের (Involution) হেতু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আত্মার উন্নতি হইতে পারে না.—বিকাশ হইতে থাকে মাত্র। বৈজ্ঞানিক আলোকের দ্বারা নূতন সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ডারুবিনের মত ঠিক নহে এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" এই নীতির দ্বারা জগৎ চলিতে পারে না। প্রাচ্যেরা বলেন যে, অন্তর্বিকাশবাদ হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যে যে প্রকার জীবাত্মার (Ego) বিকাশ হইয়াছে, অন্য প্রাণীতে এখনও সেই প্রকার হয় নাই; অর্থাৎ, আত্মার বিকাশের জন্য মনুষ্য যে প্রকার যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, অন্য প্রাণীর সেইপ্রকার যন্ত্র স্বরূপ পরিণত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অপর কোন প্রাণী মনুষ্যের জীবাত্মাকে (Ego) বহন করিবার উপযোগী এখনও হয় নাই। আত্মার অন্তর্বিকাশই পুনর্জন্মের কারণ। আত্মার উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ হইবে বলিয়া পুনর্জন্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গৃহের পূর্ণতালাভ এখনও হয় নাই; পূর্ণতালাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরমোৎকর্ষ। মনুষ্য যখন আত্মার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে, তখন তাহার জন্মচক্র রোধ হইবে; তাহার আর জন্মের প্রয়োজন হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যের বিশিষ্ট জাতিকুল কিংবা বিশিষ্ট বর্ণযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট দেশে জন্ম হইবার কারণ কি, এবং কেহ বা পুরুষ হইয়া এবং কেহ বা স্ত্রীলোক হইয়া জন্মায় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে

পারে যে, কর্ম্মফল ঐ সকলের কারণ। অতীত জন্মসমূহের ফলে আত্মা যে প্রকার চরিত্র গঠন করিয়াছে, সেই চরিত্রের উপযোগী বিকাশের জন্য, যেরূপ বর্ণ, বংশ ও জাতির ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে, মনুষ্য সেইরূপ বংশ, বর্ণ কিংবা জাতির উপযোগী শরীর এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদুপযুক্ত ফল ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। মৃত্যুর পর যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার অতীত জন্মে সে যে সকল ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে তাহার পাপের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে। যেমন নূতন উপকরণের, বর্ণের, অথবা আকৃতির পরিচ্ছদের দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পর যখন পুনর্জন্ম হয়, তখন সেই অসীম, পুরাতন আত্মাকে নূতন "ব্যক্তিত্বে" দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় মাত্র। যে এই 'ব্যক্তিত্ব' গ্রহণ করে, সে পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এখনও সেই পুরাতন আত্মা মাত্র। কিন্তু মনুষ্য কিপ্রকারে পুরুষ কিংবা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, একই আত্মা যখন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন পুরুষের ভূয়োদর্শন এবং যখন স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন স্ত্রীলোকের ভূয়োদর্শন সঞ্চয় করিয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত ঐ পুরুষ অপর জন্মে স্ত্রী হইয়া জন্মাইবে এবং ঐ স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মাইবে। যাহা হউক কিরূপ কর্ম্ম করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ হওয়া যায় তাহা "কর্ম্মবিপাক" নামক গ্রন্থে হিন্দুরা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জন্মান্তরবাদের প্রমাণস্বরূপ দুই একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১) এমন দুই একজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের অতীত জন্মের ঘটনাসমূহ বলিতে পারেন। (২) সমুদয় প্রাণিজগৎ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্যভিন্ন অপর সমুদয় প্রাণীর নৈতিক ও মানসিক উন্নতি স্থিরভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরই কেবল নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু অপর প্রাণীর উক্ত উন্নতি মোটে হয় নাই। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ (Heredity) হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের ভূয়োদর্শন সংগৃহীত হয় না। ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, জন্তুসকল পূর্ব্বে

যেরূপভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এখনও সেইরূপ ভাবে করিতেছে; যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা একই ভাবে রহিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, মনুষ্যের আত্মা জন্মজন্মান্তরের ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু অপর প্রাণীদিগের সেইরূপ হয় না বলিয়া, তাহারা স্থিরভাবে রহিয়াছে। (৩) যদি মানসিক এবং নৈতিক স্বভাব পিতা মাতা হইতে লাভ করা যায়, তবে একই পিতা মাতার সন্তানসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হয় কেন? জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ; মানসিক এবং নৈতিক গুণসমূহ আত্মাতেই অবস্থিতি করে; পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত স্থূল শরীরে বাস করে না। (৪) পূর্ব্বোক্ত পার্থক্য, যমজ সন্তানদের ভিতর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। একই পিতা মাতার সন্তান, দেখিতে একই প্রকার, কিন্তু তাহাদের ভিতর মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ। (৫) শৈশব অবস্থায় কোন কোন বালকের যে অকাল পক্কতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা জন্মান্তরবাদের অন্যতম প্রমাণ। মোজার্টের (Mozart) ন্যায় চতুর্বৎসর বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তি "পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ" এই নিয়মের (Law of Heredity) দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। মোজার্টবংশে অনেক বালক ছিল, কিন্তু ঐ বালকই বা ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন হইল কেন, ইহার উত্তর কেবল জন্মান্তর-রহস্য হইতেই বুঝা যায়। (৬) বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভার (genius) ব্যাখ্যা, জন্মান্তর-রহস্য না মানিলে, আর কোন প্রকারে মীমাংসা করা যায় না। (৭) অবস্থার অসমানতা, অর্থাৎ কেহ উচ্চ, কেহ বা নীচ হইয়া জন্মায় কেন, তাহার ব্যাখ্যা জন্মান্তরবাদ হইতেই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে, যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যের আত্মা অমর এবং এক একটী জন্ম উহাতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা জন্মান্তরবাদসম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে "সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়, এই বিনাশধর্ম্মশীল সমস্ত দেহ তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন

এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়েই আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। কেননা, আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হন না। আত্মার কখন জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই, আত্মার হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই, তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয় ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। হে পার্থ! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি জন্য এবং কিরূপে কাহাকে হনন করিবেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন! মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র গ্রহণ করে, দেহীও তদ্রূপ এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, জলও আর্দ্র করিতে পারে না। আত্মা ছিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন, ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে।" (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮-২৪।)

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যে দুই একটী আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক। (১) প্রথম আপত্তি হইতেছে যে, স্মৃতির ধ্বংস হয় কেন? যদি মনুষ্যের বার বার জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহার অতীত জন্মের ঘটনা মনে থাকে না কেন? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের আত্মা প্রতি জন্মে ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিয়া থাকে। মনুষ্যের 'ব্যক্তিত্ব' লইয়া মনুষ্যের 'রাম' 'শ্যাম' ইত্যাদি উপাধি হয়। একই আত্মা এক জন্মে 'রাম', অন্য জন্মে 'শ্যাম' এবং অপর জন্মে হয় তো 'হরি' নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাবী জন্মের চরিত্র অতীত জন্মের উপর নির্ভর করিতেছে, আমরা যদি এই জন্মে ভাল হই, তবে আমাদের ভাবী জন্মও ভাল হইবে। যিনি যথার্থ 'আমি',—অর্থাৎ আমাদের আত্মা,—তিনি সকল জন্মের কথা অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের স্থূল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া যে পাঞ্চভৌতিক 'আমির' বিকাশ হইতেছে, তাহা কখনও জন্মান্তরের স্মৃতি বজায় রাখিতে পারে না, কারণ প্রতি জন্মে উহার ধ্বংস হইয়া থাকে। এক জন্মের 'রামের' এবং অপর জন্মের 'শ্যামের' অর্থাৎ দুই জন্মের দুই নামধারী একই ব্যক্তির স্মৃতির ভিতর কোন সম্বন্ধ নাই। এই হেতু, সাধারণ লোকে অতীত জন্মের ঘটনা অবগত নহেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা অতীত জন্ম বিস্মৃত হন না। এইরূপ জাতিস্মর ব্যক্তি এখনও

বর্ত্তমান আছেন। (২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে যে, যদি জন্মান্তরশীল আত্মার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন?; প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমুদয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; এ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আদমসুমারি (Census) গ্রহণ করা হয় নাই। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এইরূপ ধরিলেও, কোন আপত্তি হয় না, কারণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যাহা আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি জন্মাইতেছে এবং অপর গুলি বিশ্রাম লইতেছে। যাহারা বিশ্রাম লইতেছে, তাহাদের সংখ্যা, যাহারা জন্মাইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এক সময়ে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অপর সময়ে যে হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? (৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, অনেকে বলেন যে, জন্মান্তরবাদ, পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ এই নিয়মকে (Law of heredity) খণ্ডন করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না, বরঞ্চ যে সকল উদাহরণে ঐ নিয়ম খাটে না, ঐ সকল উদাহরণেরও জন্মান্তরবাদ মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন পিতা মাতা যেরূপ হয়, সন্তানও সেইরূপ হইবে; উহাদের যদি কোন স্থায়ী পীড়া থাকে, তবে সেই পীড়া সন্তানেও সংক্রামিত হইয়া থাকে; উহাদের মানসিক গঠন যেরূপ, সন্তানেরও মানসিক গঠন সেই প্রকার হওয়া উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না; যেমন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপিষ্ঠের পুত্রও অতি ধার্ম্মিক হয়, অতি মূর্খের সন্তানও বিদ্বান্ হয়, ইত্যাদি; এই সকল ক্ষেত্রে জন্মান্তরবাদ হইতেই উহাদিগের মীমাংসা হইয়া থাকে। এইরূপ আরও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সকলগুলিই জন্মান্তরবাদের দ্বারা খণ্ডন করা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুনর্জন্ম হয় কিনা, তাহা তর্কদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলেই আপনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্"। সুতরাং যুক্তি দ্বারায় জন্মান্তরগ্রহণ প্রমাণ করিতে বিরত থাকাই শ্রেয়স্কর।

অনেকে প্রাচ্যদিগের জন্মান্তরবাদকে ঈজিপ্‌সিয়ানদিগের 'মেটেম্‌সাইকোসিস্' * (Metempsychosis) বাদের সহিত গোল করিয়া থাকেন;

* "The Egyptians are, moreover, the first who propounded the theory that, the human Soul is immortal, and that when the body of any one

এইরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, পাইথ্যাগোরাস্ (Pythagoras) 'মেটেম্‌-সাইকোসিস্‌বাদ' গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্লেটো (Plato) উহার সাহায্যে, তাঁহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়া ছিলেন। ঈজিপ্‌সিয়ান্‌রা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তর (Trasmigration) নামক চক্রে তিন সহস্র বৎসরের জন্য প্রবেশ করিয়া থাকে। মনুষ্য-আকার ধারণ করিবার পর তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে আত্মা পুনরায় মনুষ্য আকার ধারণ করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এই সময়ের মধ্যে উন্নতির সকল সোপান দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে হইত—জীবনের অতি নিম্ন বিকাশ হইতে, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী এবং পশুর ভিতর দিয়া অবশেষে মনুষ্য-রূপ ধারণ করিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জন্মান্তরবাদ এইরূপ নহে, ঠিক ইহার বিপরীত; জন্মান্তরবাদ হইতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর পর প্রায় স্বজাতীয় রূপ ধারণা করিয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যে জাতীয় ছিল, সেই জাতীয় আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। 'প্রায়' কথাটী এই জন্য ব্যবহার করিলাম যে, কর্ম্মফলানুসারে এই নিয়মেরও সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু ঈজিপ্টে মনুষ্যের আত্মা বিড়াল, কুম্ভীর কিংবা ষণ্ড প্রভৃতির ভিতর অবস্থান করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এই সকল প্রাণীরা তথায় পূজার্হ হইয়াছে এবং এই সকল প্রাণীর আকৃতি মনুষ্যের আকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া, তাহারা দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথা এইরূপ নহে; যেখানে কোন জন্তু পূজিত হইয়া থাকে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, কতক গুলি অমানুষিক গুণের জন্য,—যেমন হস্তী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য, ষণ্ড শারীরিক বলের জন্য, সিংহ সাহসের জন্য,—অথবা বিষ্ণুর অবতারদিগের সম্মান-প্রদর্শনের জন্য, কিংবা কোন পৌরাণিক রূপকস্বরূপ, এই সকল জন্তু পূজিত হইয়া থাকে। ঈজিপ্টে দেবতাসকল জন্তুর গুণসমূহ ধারণ করিত বলিয়া, জন্তু সকল পূজিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে জন্তুসকল আমাদের

perishes it enters into some other creature that may be born ready to receive it, and that, when it has gone the round of all created forms on land, in water, and in air, then it once more enters a human body born for it; and this cycle of existence for the soul takes place in three thousand years." (Herodotus. ii. 123)

ন্যায় একই পরম পিতার সন্তান বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যদিগের মধ্যে সাধারণ লোকেরা, আপনাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে জন্তুদিগের দেবতার সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়; এই জন্য তাহারা প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া লইয়াছে,—যেমন সর্প দেবতা, কুম্ভীর দেবতা, ব্যাঘ্র দেবতা ইত্যাদি। এই সকল দেবতারা ঐ সকল জন্তুদিগের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের জন্য মন্দিরাদি এবং পীঠস্থান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং যে সকল ব্যক্তি, যে সকল জন্তুর সংস্রবে সর্ব্বদা আসিয়া থাকে, সেই সকল জন্তুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, সেই সকল জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের সন্তোষের জন্য পূজাদি দিয়া থাকে। এবং এই জন্যই যে সকল য়ুরোপীয়েরা এই থানে আসিয়া থাকেন, তাহারা এই সকল লোককে, ঐ সকল জন্তুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। যেমন মনুষ্যের সংবিৎ, মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 'কোষ' সমূহের (Cells) পৃথক্ পৃথক্ জীবনসমূহকে একত্র করিয়া একটী প্রাণরূপ সমষ্টিতে (Unit) পরিণত করে, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত কোন দেবতা তাহার অধীনস্থ জন্তুদিগের সামুদায়িক ব্যক্তি (Colle
কোনটী সর্পসমষ্টি, (Unit) কোনটী ব্যাঘ্রসমষ্টি ই
একটী মনুষ্যকে একটী সম্পূর্ণ জীব বলিয়া বর্ণনা করা
স্তরের কোন প্রাণীকে, মনুষ্যরূপ সম্পূর্ণ সমষ্টির ন্যা
(Unit) অংশ বলা যাইতে পারে। অতএব কো
সর্পের জন্ম হওয়াও যে কথা, আর মনুষ্য শরীরের কে
পুনর্জন্ম হওয়াও প্রায় সেই কথা।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

(প্রাচ্যমতে জন্মান্তরবাদের সমালোচনা)

—০ঃ)*(ঃ০—

জন্মান্তরগ্রণের কারণ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা
জুষ্টস্তেনামৃতত্বমেতি॥" (১—৬)

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মচক্র সমুদয় জীবের উৎপত্তি এবং আধার, সেই ব্রহ্মচক্রে হংস, অর্থাৎ এক একটী জীব, আপনাকে প্রেরয়িতা, হইতে পৃথক্ ভাবিতেছে; যখন তাঁহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইবে, তখন তাহার মুক্তি হইবে। সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, যত দিন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবিবে, তত দিন তাহার মুক্তি হইবে না; ততদিন তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপ পৃথক্ ভাবিবার কারণ হইতেছে অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্য মনুষ্যের রূপ-রস-জ্ঞান জন্মিতেছে। রূপ-রস-জ্ঞান হইতে সুখের তৃষ্ণা উৎপত্তি হইতেছে; সুখের তৃষ্ণায় মনুষ্য কর্ম্মে রত হইতেছে এবং কর্ম্মফলে মনুষ্য জন্মাইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা দূর হইলে অর্থাৎ মনুষ্য যখন নিজকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া বুঝিবে, তখন জন্মচক্র রোধ হইবে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" (১—৯)

অর্থাৎ উভয়েই জন্মহীন,-একটী জ্ঞানী অপরটী অজ্ঞানী, একটী ক্ষমতা-বিশিষ্ট, অপরটী ক্ষমতাহীন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপ পার্থক্যের কারণ হইতেছে, অবিদ্যা বা মায়া। ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে, কিন্তু যখন জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন ঐ সকল বিষয় প্রকাশমান অবস্থা হইতে সমবেত (inherent) অবস্থায় আসিয়া থাকে। অন্তর্বিকাশের দ্বারা ঐ

সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; জন্মমৃত্যু গ্রহণের দ্বারাই অন্তর্বিকাশ হইতে থাকে। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির অধীনে আসিয়া থাকে, তখন প্রথমতঃ খনিজ, তৎপরে উদ্ভিদ্ রাজত্বের বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। তাহার পর যথাক্রমে স্বেদজ, অণ্ডজ এবং অবশেষে জরায়ুজ জন্মগ্রহণ করে।

তন্ত্রশাস্ত্রে অন্তর্বিকাশের ধারা, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততোঽপি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদির্দ্বিলক্ষকম্॥
উত্তমাচ্চোত্তমং জাতমাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাম্॥"

স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য-মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে দশ লক্ষ, এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্যজন্মেও প্রথমতঃ কুৎসিতাদি মনুষ্য কুলে দুইলক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতেও উত্তমতর জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম গ্রহণ করিয়া যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ যাতনা ভোগ করে। কল্পকল্পান্তর ধরিয়া জীবের যে প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্থাবরযোনি, তৎপরে মৎস্যমকরাদিযোনি তৎপরে কৃমি এবং কীটপতঙ্গযোনি, তৎপরে পক্ষিযোনি তৎপরে পশুযোনি, তৎপরে বানরযোনি, এবং অবশেষে মনুষ্যযোনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। বানর হইতে যে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা যে ডারুবিন (Darwin) সাহেব, নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে তাঁহার বহুপূর্ব্বে প্রাচ্য মনীষিগণ উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রকার চতুরশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশফলে এই যুগে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপ অন্তর্বিকাশের দ্বারা জীবের দুই প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, তাহার পার্থিব আকৃতির উন্নতি হইতে থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ

তাহার সংবিতের প্রসারণ বা উন্নতি হইতে থাক। প্রথমটিকে পাশ্চাত্যেরা পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ (Heredity) বলিয়া থাকেন। এক আকৃতি হইতে অন্য আকৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া মনুষ্যের 'ব্যক্তিত্ব' (Personalities) পুত্রপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে; কিন্তু মানসিক এবং নৈতিক গুণসকল কেন সংক্রামিত হয় না, তাহা পাশ্চত্যেরা ঠিক করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যেরা বলেন যে, মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যেমন সংক্রামিত হয়, মনুষ্যের সংবিৎও সেইরূপ অবাধে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যের আকৃতির যেরূপ উন্নতি হইতেছে, মনুষ্যের সংবিতের ও সেইরূপ উন্নতি বা প্রসারণ হইতেছে। একটী শরীর অব্যবহার্য্য হইলে জীবাত্মা তাহার উপযোগী অন্য একটী শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যের আকৃতির এবং সংবিতের অবিচ্ছেদ (continuity) বর্ত্তমান থাকে।

যখন জীবাত্মা ক্রমে জান্তবরাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যরাজত্বে প্রবেশোন্মুখ হয়, তখন ঈশ্বরের তিনটী বিভাব (aspects),—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া,—আত্মজ্ঞানরূপে (Self-consciousness) মনুষ্যে স্পষ্টতর প্রতিফলিত হয়। তখন অহং-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ ব্যবস্থিত হয় এবং মনুষ্য কোন্‌টী 'অহং' এবং কোন্‌টী 'নাহং' বুঝিতে পারে। জান্তবরাজত্বে মনুষ্যের কামনা-স্বভাব গঠিত হইয়াছে, উহা মানবরাজত্বে আরও বলবতী হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রথমে কামনার বশীভূত থাকে কিন্তু যখন দেখিতে পায় যে, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ পাইতেছে, তখন কামনাকে বশে আনিতে চেষ্টা করে এবং যখন বশে আনিতে পারে, তখন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ক্ষমতা সকল লাভ করিয়া থাকে। তখন তাহার পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় হয় এবং অবশেষে তাহার মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। তখন জন্মমৃত্যুচক্র রোধ হইয়া যায়।

মনুষ্য যদিও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সময় সময় ঐ পথ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্ম্মফলে, অর্থাৎ আত্মাবনতির দ্বারা মৎস্য, সর্প, মেষ প্রভৃতি অপকৃষ্ট জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা কি রূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচ্যদিগের উপদেশ স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্য দুই-প্রকার উপাদানে গঠিত হইয়াছে,—একপ্রকার, মানবীয় (human) এবং অপর প্রকার, জান্তব (animal)। প্রথম প্রকার উপাদান, অর্থাৎ মানবীয় গুণ বা আত্মজ্ঞান, মনুষ্যের আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে। মনুষ্যের

পূর্ব্বোক্ত প্রথম উপাদানটী তাহার দ্বিতীয় বা জান্তব উপাদানের উপর ঠিক যেন উপর্য্যুপরি স্থাপিত থাকে। পার্থিব জীবনে এই দুইটী উপাদান সংযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর পর উহাদের বিশ্লেষণ ঘটে। মনুষ্যজন্মে যেমন তাহার জান্তব উপাদানের উপর তাহার মানবীয় উপাদান স্থাপিত থাকে, সেই রূপ অন্য প্রাণীর জান্তব উপাদানের উপর মনুষ্যের মানবীয় উপাদান শাস্তিস্বরূপ স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য প্রাণীর, মস্তিষ্ক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমূহ, মনুষ্যের আত্মার চালনার উপযোগী না হওয়াতে উহারা মানবীয় ক্ষমতা সকল প্রদান করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া গলা টিপিয়া ধরিলে, তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত আত্মারও ঐ জন্মে সেই রূপ কষ্ট হইতে থাকে। ঐ জন্মে কর্ম্ম করিবার জন্য তাহাকে যে যন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে সে, অন্য ব্যক্তিকে তাহার প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না এবং যদিও জন্তুর ন্যায় তাহার আকার হইয়াছে এবং তাহার ন্যায় কার্য্য ও অনুভব করিতেছে—তথাচ সে যে অপর জন্তুদিগের ন্যায় সামান্য জন্তু নহে, এই জ্ঞান ভিন্ন ইহার অন্য জ্ঞান থাকে না এবং ইহা নিজেও ইহার যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারে না। তবে ইহা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে, কোন পাপের জন্য ইহার এইরূপ দশা হইয়াছে। প্রত্যেক জন্তুতেই যে এইরূপ পাপগ্রস্ত আত্মা বাস করে, তাহা নহে এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন কোন মহাত্মা দেখিবামাত্র জানিতে পারেন যে কোন্ জন্তুতে ঐরূপ আত্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—বুদ্ধদেবের ঐ রূপ শক্তি ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলি বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্যদিগের পূর্ব্বোক্ত মত, একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মনুষ্যের আত্মা, কোন জন্তুতে আবদ্ধ রহিয়াছে, দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এক মনুষ্যে দুই তিন জন পৃথক্ ব্যক্তির 'আবেশ' দৃষ্ট হইয়া থাকে,—অর্থাৎ একই সময়ে দুই তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব' (personalities) একই শরীরে আশ্রয় লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিয়া থাকে। ইহাকে পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীরা "double or multiple personalities"এর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের আত্মাকে কোন জন্তুর শরীরে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন জান্তব (animal) ও মানবীয় (human) উপাদানের পার্থক্য করিতে হয়, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বুদ্ধির

(intellectual) উপকরণ ও পাশব (animal) উপকরণের পার্থক্য করা হইয়া থাকে।

মনুষ্য মৃত্যুর পর পশ্বাদি যোনি গ্রহণ করিতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মনুষ্য যখন আপনাকে অবনতির পথে লইয়া যায়, তখন মনুষ্য ক্রমোন্নতির যে সোপানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সোপানে উপনীত হইতে পারে না। তখন নিম্নশ্রেণীর জীবের আকৃতি গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং জন্তু, উদ্ভিদ্ অথবা খনিজ জীবের সহিত একশরীরবাসী (Co-tenant) হইয়া বাস করে। মনুষ্যের যাহা শিক্ষা করিবার অবশিষ্ট ছিল, তাহা শিক্ষা হইলে মনুষ্য আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। কোন জন্তুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকিলে মনুষ্য পুনর্জন্মগ্রহণের সময় ঐরূপ জন্তুর আকৃতি ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভরত রাজা হরিণ ভাবিতে ভাবিতে হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুষ্য, কর্ম্মফলে যে পশ্বাদিযোনি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ— হিন্দুশাস্ত্রে অনেক আছে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যোনি মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (কঠোপনিষৎ, ৫-৭)

অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম্ম ও যাহার যেমন জ্ঞান, তদনুসারে শরীর ধারণ জন্য যোনিতে প্রবেশ করে; অপর কেহ কেহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম॥" (১২-৯)

অর্থাৎ শারীরিক কর্ম্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্ম্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি এবং মানস কর্ম্ম-দোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা ভরত, হরিণ-জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-জাতক-মালায় উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মসমূহে সর্প, ব্যাঘ্র, হস্তী, রাজপুত্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যজন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, যে সকল মনুষ্য নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহারা কেহ আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) বিস্মৃত

হয় নাই। ভরত রাজা যখন হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন নাই। সাধারণ জন্তু এবং মনুষ্যের ভিতর, এই আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) লইয়াই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু জন্তুদের তাহা নাই। যে সকল মনুষ্য, কর্ম্মদোষে জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের আকৃতি, দেখিতে জন্তুর ন্যায় হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি জন্তুর ন্যায় নহে। সাধারণ জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে না, কিন্তু উক্তপ্রকার জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে। মনুষ্য নিজের মনুষ্যত্ব—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) হারাইয়া জন্তুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ক্রম-বিকাশের সোপানপরম্পরা আরোহণ করিয়া জীবসকল, ক্রমবিকাশের (Evolution) যে সোপানে মনুষ্যরূপে অধিষ্ঠিত, সেই সোপান হইতে নিম্নে অবতরণ অতি কচিৎ ঘটিয়া থাকে।

জন্মান্তরগ্রহণ কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা অন্য কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর মনুষ্যের কি গতি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেদান্তে দুইটী মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মার্গদ্বয়, স্থানবিশেষ নহে; ইহারা অবস্থাবিশেষ। প্রথম হইতেছে—উত্তরমার্গ বা দেবযান এবং দ্বিতীয়টী—দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযান। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া পরলোকে গমন করেন। তথায় পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভাশুভকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা কুক্কুর, শূকর কিংবা চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক অথবা প্রতীকোপাসক, তাঁহারা উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে উত্তর মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশীল গৃহস্থেরা দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযানে গমন করেন।

দেবযানগামীরা ব্রহ্মলোকে নীত হন বলিয়া, এই পথের অপর নাম ব্রহ্মপথ। পিতৃযানগামীরা স্বর্গভোগার্থ চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। চন্দ্রমণ্ডলকে স্বর্গলোক বা দেবলোক বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা দেবযানগামী হন; এবং যাঁহারা সকাম তাঁহারা পিতৃযানগামী হন। পুণ্য-কর্ম্মশীলদিগের জন্য এই দুই মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা ইষ্টাদিকারী

নহে, বরঞ্চ অনিষ্টকারী অর্থাৎ পাপাচারী, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিতে পারে না, তাহারা যমালয়ে অর্থাৎ প্রেতলোকে গমন করিয়া নিজ-কর্ম্মফলানুযায়ী যাতনা অর্থাৎ নরক ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণের নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে। যাহারা বিদ্যাকর্ম্মশূন্য (যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ), তাহাদের লোকান্তর হইতে গতি বা লোকান্তর হইতে অবগতি হয় না। তাহারা ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়।

উত্তরমার্গ বা দেবযান, বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর দেবযান যে একরূপ, তাহার আর অন্যথা নাই। বেদান্ত-দর্শনানুমত দেবযান, নিম্নে বর্ণিত হইল।

উত্তর-মার্গ-গামীরা প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ দেবতা হইতে অহর্দ্দেবতা, অহর্দ্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা হইতে দেবলোক দেবতা, দেবলোক দেবতা হইতে বায়ুদেবতা, বায়ুদেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতা, বিদ্যুদ্দেবতা হইতে বরুণ দেবতা, বরুণ দেবতা হইতে ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্র দেবতা হইতে প্রজাপতি দেবতা প্রাপ্ত হইয়া, উপাসক পরে ব্রহ্ম-লোকে নীত হন। দেবযানগামী জীব, বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্য বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

অর্চ্চিরাদি দেবতা, অতিবাহিকী দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা মৃতজীবকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ দেবতা, অহর্দ্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দ্দেবতা শুক্লপক্ষ দেবতার নিকট, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতার নিকট ইত্যাদি রূপে তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া পুণ্যশীল সত্যলোকে উপস্থিত হন। পুণ্যশীল ব্যক্তি এই প্রকারে একভাব হইতে অন্যভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।

দেবযানগামীরা বর্ত্তমান কল্পে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরা পরাবতো বসন্তি।"

(৬—২—১৫)

অর্থাৎ তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

দক্ষিণ মার্গ, নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত জীব প্রথমতঃ ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা, তাহাকে রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায়; রাত্রি দেবতা কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক দেবতার নিকট, পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট, আকাশ দেবতা অবশেষে তাহাকে চন্দ্র দেবতার নিকট লইয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং।" (৬—২—১৬)

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মনুষ্য পিতৃলোকে যায়, তৎপরে পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে যায়। যে সকল মনুষ্য জন্মমৃত্যু-চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছেন, তাঁহারা পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকের যে অংশে যান, তাহাকে চন্দ্রলোক বলে। স্বর্গলোকের অন্যান্য অংশ আছে, যথা, ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি। জীব বিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল লোকও লাভ করিতে পারেন। চন্দ্রমণ্ডলে তাহার ভোগোপযোগী জলময় দেহ নির্ম্মিত হয়। এই জলময় দেহকে মনোময় কোষ বলা হয়। যে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ দ্বারা সেই কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আর সে ক্ষণকালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। তখন জীব পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে।

ইহলোকে আগমন ব জন্মান্তরগ্রহণের প্রণালী এইরূপ। কর্ম্মক্ষয় হইলে চন্দ্রলোকীয় জলময় শরীর বা পুরাতন মনোময় কোষ বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আসিয়া থাকে। এই আকাশভূত জীব, জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ চাল্যমান হইয়া বায়ুভাবাপন্ন হয়, ক্রমে ধূমভাব এবং তৎপরে অভ্র বা কুজ্ঝটিকাভাবাপন্ন হয়। অভ্রভাব হইতে মেঘভাবাপন্ন হয়। তৎপরে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। অর্থাৎ এই সকল জলীয় ব্যাপারের দ্বারা মনুষ্যের নূতন জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ নির্ম্মিত হয়। বারিধারার সহিত ঐ সকল জীব, ওষধি, বনস্পতি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ ইত্যাদি প্রকার বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। বর্ষধারার সহিত পতিত বীজ পর্ব্বতভট, দুর্গমস্থান নদী, সমুদ্র, অরণ্য এবং মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষাদি ভাব হইতে তাহার নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। মনুষ্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার স্ত্রীর

গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল রূপকবর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীব যথাক্রমে নূতন প্রাণময় এবং অন্নময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। ঐ জীব নয় দশ মাস কাল তাহার মাতার গর্ভে থাকিয়া অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়। যে স্থানে ক্ষণিক অবস্থান করিতে কষ্টের অবধি থাকে না, সেই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা যে কত কষ্টকর—তাহা বলাই বাহুল্য।

অর্চ্চিরাদির অভিমানিনী দেবতাদিগকে পরাবিদ্যা (Theosophy) অনুসারে প্রাকৃত গণদেবতাদিগের (Natural Elementals) প্রধান (Lords) বলা হইয়া থাকে। প্রাকৃত গণদেবতাদিগকে (Natural Elementals) প্রাকৃত উপদেবতাও (Nature Spirits) বলা হয়। ইহারা পাঁচভাগে বিভক্ত; ক্ষিতি (Earth), অপ্ (Water), তেজঃ (Fire), মরুৎ (Air) এবং ব্যোম (Ether)—এই মূল পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত হইতে বিভিন্ন গণদেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর ভূতকে পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহাদিগের দ্বারা দৈবশক্তি বিভিন্ন প্রদেশে নীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত গণদেবতার উপর এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রকৃতির নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভূতের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র হইতেছেন আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আদিত্য বা অগ্নি হইতেছেন তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পবন হইতেছেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রজাপতি হইতেছেন ক্ষিতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আদিত্য, তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়া তেজঃ, বিভিন্ন ভূমিতে (Planes) অবস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার অনুচরবর্গ বা আগ্নেয় গণদেবতা সমূহের (Fire Elementals) সহিত প্রকৃতির তেজঃসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এই প্রকার অন্যান্য ভূতের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ তাহাদের অনুচরগণের (Elementals) সহিত প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। মনুষ্য, যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন প্রত্যেক ভূতের অনুচরবর্গ (Elementals) মনুষ্য-শরীরের নির্দ্দিষ্ট ভূত সকলকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যায়,—এই প্রকারে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় লইয়া যাইয়া থাকে। এই প্রকারে ভূতসকল তাহাদের সাহায্যে এক ভূমি (Plane) হইতে অন্য ভূমিতে (Plane) উপস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রজাপতিকে পৃথিবী-গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা (Logos) বলা হইয়া থাকে। মনুষ্য, প্রজাপতির নিকট নীত হইলে পর সত্যলোক প্রাপ্ত হয়।

ভূতসকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবকে লইয়া দেবলোকে (Devachan) উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎপরে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় বায়ু দেবতা, বায়ুর অংশ গ্রহণ করেন, আদিত্য, তেজের অংশ গ্রহণ করেন, বরুণ জলীয় অংশ গ্রহণ করেন, ইন্দ্র আকাশের অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রজাপতি, ক্ষিতির অংশ গ্রহণ করেন। জীব অবশেষে ভূত (Matter) হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মা (Spirit) রূপে প্রকাশ পাইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেবযান বা শুদ্ধ মার্গ বলে। পুণ্যশীল নিষ্কাম ব্যক্তি এই মার্গ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। জীব, বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে কোন অমানব পুরুষ, তাহাকে সত্যলোকে লইয়া যায়। এই অমানব পুরুষ, ভগবানের অনুচর; তাঁহার কার্য্যের সাহায্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইঁহারাই মহাত্মা বা মহাপুরুষ। পুরাণে ইঁহাদিগকে কুমারসৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের কৃপায় পুণ্যশীল ব্যক্তি ভবসাগর পার হইয়া থাকেন।

যাঁহারা পুণ্যশীল সকাম ব্যক্তি, যাঁহাদিগের রূপরাগ বা স্বর্গাদির কামনা আছে, তাঁহারা পিতৃযান প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত যে সকল দেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাঁরা সম্ভবতঃ বিভিন্ন গণদেবতা। মৃত্যুর পর ইঁহারা বিভিন্ন ঈথিরীয় অবস্থার ভিতর দিয়া জীবকে পিতৃলোকে (Astral Plane) লইয়া যান। তৎপরে পুণ্যশীল সকাম পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলে (Devachan) নীত হন। তথায় তিনি সুখভোগ করিয়া ইহলোকে অবরোহণ করেন। চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইবার সময় জীব জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে এই শরীর মিলিত হইলে পর, জীবের সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জীব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিশেষে পৃথিবীর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছে। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারে না; তাহারা যমালয়ে (Astral Plane) যায় এবং তথায় নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে।

চন্দ্রলোক বা যমলোক হইতে আগমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি, দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে

পতিত হইবার সময় যেমন তাহার সংজ্ঞা থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণের সময় জীবদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে না। কেননা, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুভূত কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাবানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম থাকে, চন্দ্রলোকগামী জীব সে পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে। এবং কর্ম্মক্ষয় হইলে পূর্ব্বোক্ত পথে ইহলোকে আগমন করে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্ম্মক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি কর্ম্মশেষ না থাকে, তাহা হইলে ইহলোকে অবরোহণপূর্ব্বক পুনর্জ্জন্মগ্রহণ এবং সুখদুঃখভোগ কিরূপে হইতে পারে? বুধগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বর্গভোগজনক কর্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে, পূর্ব্বসঞ্চিত ঐহিক কর্ম্মফলঅনুসারে জীবের ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। চন্দ্রমণ্ডলারূঢ়দিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত হইয়া সঞ্চিত পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম শরীর পরিগ্রহ করে। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয় চরণ অভ্যাসোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।"

অর্থাৎ—যাঁহারা, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহলোকে সমাগত হন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যশীল, তাঁহারা শুভযোনি প্রাপ্ত হন। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর, যাহারা পাপশীল, তাহারা কুক্কুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র সমুদয় হিন্দুজাতি, যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা নহে; হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মেও জন্মান্তরবাদসম্বন্ধে মোটের উপর একমত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য মতে যাহাকে 'আমি' বলে, তাহা ক্ষণস্থায়ী 'আমি' এবং যাহা যথার্থ 'আমি' তাহা চিরস্থায়ী। এক ব্যক্তিই একজন্মে ভাল, অপর জন্মে মন্দ, একজন্মে সুন্দর, অপর জন্মে বিশ্রী, ইত্যাদি প্রকার হইলেও, সে ব্যক্তি যাহা—তাহাই থাকে, অর্থাৎ তাহার চিরস্থায়ী বা পাকা 'আমি'র কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মান্তরবাদের

বিপক্ষে জড়বাদীরা, এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—কোন লোক তাহার প্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তবে জন্মান্তরবাদ মানিয়া, প্রিয়ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া, মনে কষ্ট আনিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি আমরা গুণ ধরিয়া বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সকল ব্যক্তিই সমান ভালবাসার পাত্র। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনরূপ "লটারি" 'সমান ভালবাসার' পাত্র সকলের মধ্যে কতকগুলিকে আরও অধিক ভালবাসার পাত্র করিয়াছে এবং অপর কতকগুলি 'সমান ভালবাসার' পাত্রদিগকে অপর ব্যক্তিদের ভালবাসার পাত্র করিয়াছে। পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রসকলকে বিনিময় করিয়া অপর পাত্রসকলকে গ্রহণ করিয়া থাকি; ইহারাও পূর্ব্বের ন্যায় সমান ভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বের পাত্র সকলকে হারাইয়া ফেলি না। মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহার চক্রে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদের প্রিয়পাত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই; এবং যেমন মধুমক্ষিকা আবার তাহার ভাণ্ডারে মধু সঞ্চিত করিবার জন্য পুনরায় পুষ্পসকল খুঁজিয়া বেড়ায়, সেইরূপ যখন আমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তখন অপর প্রিয়পাত্রদিগকে সংগ্রহ করিয়া লই। কারণ, যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদের যথার্থ 'আমি' অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত ভালবাসার যোগ্য, তাহা অবিনশ্বর এবং চিরকালের জন্য আমাদের আপনার হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

